Vol. 52 | No. 3 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আধুনিকায়ন ও বাংলাদেশের কবিতা : তত্ত্বরূপের সন্ধান

Volume	52
Issue	3
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i3.5
Pages	87-116
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আধুনিকায়ন ও বাংলাদেশের কবিতা : তত্ত্বরূপের সন্ধান

Check for updates

মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম*

আধুনিক সমাজের পেছনে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি-প্রক্রিয়া। মানুষ যেমন আধুনিক হয়ে উঠেছে তেমনি আধুনিক হয়ে উঠেছে মানুষের শিল্পকলা-কাব্য ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ। সামাজিক আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলারও আধুনিকায়ন ঘটেছে। কিন্তু পৃথিবীর সব ভূখণ্ডে আধুনিকায়নের রীতিপদ্ধতি এক নয়। স্থানিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতায় যেমন আধুনিকতার ধারণা বদলে গেছে, তেমনি ক্ষমতাধরের আধুনিকতাবোধও শোষিতের মনে আরোপিত হয়েছে। ইউরোপীয় চিন্তাতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত তৈরি করে দিয়েছে বঙ্গীয় আধুনিকতার প্রধান খাত। বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও আধুনিকতার বহু রকম আর্থবৈশিষ্ট্য দ্বারা তাড়িত হয়েছে। কখনো-বা খোঁজা হয়েছে আধুনিকতার স্বদেশি প্রতিকৃতি। কিন্তু সেই প্রতিকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই অস্বচ্ছ, ধূসর। আর তাই ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তির পঞ্চাশ-ষাট বছর পরও আমরা আধুনিকতার ভাবনা-পরিসর নির্ণয় করি ইউরোপীয়দেরই নানা রকম উদ্যম ও আয়োজনের ভেতর। এ-কারণে শুরুতে আমরা আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ ও আর্থপরিধি স্পষ্ট করে নিতে চাই এবং দেখতে চাই ইউরোপের আধুনিকতা-বিষয়ক ভাবনা ও তার সম্প্রসারণ। প্রশ্ন উঠতে পারে, ইউরোপ থেকেই আরম্ভ কেন? আরম্ভটা ইউরোপের ইতিহাস থেকেই করতে হয়, কেননা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নিয়মেই আধুনিকতা উপনিবেশিত ভূখণ্ডগুলোতে পৌঁছেছে কিংবা তাকে পৌঁছানো হয়েছে। আর এটি প্রায় উপেক্ষাতীত সত্য যে, রাজনীতির পৃথিবীব্যাপী ইতিহাসে ইউরোপ কর্তাসত্তার ভূমিকা রেখেছে এবং ইতিহাস বলতেই বুঝতে হয় বিশ্বজনীন ইতিহাস (Universal History), কর্তার বয়ান (master narrative) এবং সমগ্রবাদী কর্তার (totalitarian author) কথকতা। আমাদের দেখবার বিষয়, এই কথকতার পরিধি কীভাবে বর্ধিত ও স্ফীত হল এবং কী করে বাংলা-অঞ্চলে এই পরিধি-পরিবর্ধন চলিষ্ণু থাকল।

২. আধুনিকতা, আধুনিকায়ন ও আধুনিকতাবাদ : তাত্ত্বিক পরিধি

২.১. *ইতিহাসের দিগ্বলয়*

ইউরোপের সমাজ বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরান্তরের ফল হিসেবে আধুনিকতা ধারণার উদ্ভব ও পরিণতি। আধুনিকতার বিকাশ-প্রতিষ্ঠায় কয়েকটি প্রভাববিস্তারী পর্বান্তর, যেমন : রেনেসাঁস (১৩০০-১৭০০), রিফর্মেশন (১৫০০-১৬০০), আলোকপর্ব, আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৫-১৭৮১), ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯), শিল্পবিপ্লব (১৮ শতকের শেষভাগ থেকে

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯ শতকের প্রথম ভাগ)। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ সব আন্দোলনের সংঘটন-স্থান ও অভিমুখ এক নয়। কিন্তু একটির সঙ্গে অন্যটির সংযোগ ও সংহতির ফলে আধুনিকতার চেহারাটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

ইতালীয় রেনেসাঁস সেই অবয়বনির্মিতির প্রথম স্তম্ভ। এই কালেই শুরু হয়েছিল গ্রিক-রোমান ধ্রুপদী জ্ঞানের নতুন পাঠ। সমাজ, শিল্পকলা, ধর্ম, সাহিত্য, ভাষা, বাণিজ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসার ব্যতিক্রমী সূচনা রেনেসাঁসের দান। তাছাড়া ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের আত্মজ্ঞানের বোধ। রেনেসাঁসীয় জীবন-উচ্ছ্বাসে পরিমিতি আনতে চেয়েছিল রিফর্মেশন আন্দোলন। রিফর্মেশন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মূলত রোমান ক্যাথলিক গির্জার দুর্নীতি, অনৈতিক ক্ষমতাচর্চার বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া হিসেবে। মূলত রেনেসাঁসের বুদ্ধিবৃত্তিক-নান্দনিক জাগরণ ইউরোপকে মানবিক উপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে — যেখানে মানুষ কেবলই ধর্মের দাস নয়, আত্মজ্ঞানে সম্ভাবনাময়।

রেনেসাসঁ ও রিফর্মেশনের তরঙ্গ পেরিয়ে আঠার শতকে পশ্চিম ইউরোপ নতুন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার এই স্তরের নাম আলোকপর্ব (the Enlightenment)। এই পর্ব কতগুলো চিন্তা বা ধারণার সমষ্টি, বৃদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন এবং বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত যোগাযোগের সমন্বিত রূপ। আলোকপর্বের প্রধান দশটি প্রসঙ্গ হল (Hamilton, 1995 : 21-22) : ১. কারণ (reason) ২. অভিজ্ঞতাবাদ (empiricism) ৩. বিজ্ঞান (science) ৪. বৈশ্বিকতা (universalism) ৫. প্রগতি (progress) ৬. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism) ৭. সহিষ্ণুতা (toleration) ৮. মুক্তি (freedom) ৯. মানবপ্রকৃতির সমধর্মিতা (uniformity of human nature) ১০. ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism)। প্যারিস, এডিনবার্গ, গ্লাসগো, লন্ডন প্রভৃতি মহানগরে উদ্ভূত ও বিকশিত চিন্তার এই নতুন ধারণাগুলো খ্রিষ্টত্ববাদী প্রচলিত চিন্তাধারায় প্রচণ্ড আঘাত করতে সক্ষম হয়। ফরাসি বিপ্লব আলোকপর্বের এই জ্ঞানজাগতিক উত্থানের একটি রাজনৈতিক সক্রিয়তা। অভিজাতবর্গের ক্ষমতার প্রতি লোভ, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাজকোষের দুরবস্থা, কৃষকদের ওপর নিপীড়নের মাত্রাবৃদ্ধি, যাজকদের ধর্মীয় শোষণ ইত্যাদিকে ফরাসি বিপ্লবের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ-বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে তুলেছে জনগণের অধিকার ও বুর্জোয়া শাসনের সৌধ। ফলে ইউরোপ পেয়েছে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা। এতে করে সম্প্রসারিত হয়েছে জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্রের বোধ। অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লব-কালীন বা বিপ্লব-উত্তর ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদিত পণ্যের মতোই জ্ঞানেরও দ্রুত প্রসার ঘটেছে। আর আলোকপর্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিধারণাই ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে গতিশীল করেছে।

থমাস ডচের্টি আধুনিকতাবাদের উদ্ভবের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মুহূর্তের কথা বলেছেন। যেমন : মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্ব যা জাদুবিদ্যাকে প্রশ্ন করতে সক্ষম হয়েছে, ইউরোপীয় রেনেসাঁস যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রণোদনা যুগিয়েছে, এছাড়া রয়েছে আলোকপর্বের দার্শনিকতা এবং বিশ শতকের অভিমুখে শৈল্পিকভাবে আত্মসচেতন পরীক্ষানিরীক্ষা (Docherty, 1990)। মূলত রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-আলোকপর্ব-ফরাসি বিপ্লব-শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপ

মধ্যযুগ থেকে যেমন নিজের ইতিহাসকে আলাদা করেছে তেমনি ইউরোপ-বহির্ভূত ভূখণ্ডের ইতিহাসেও জুড়ে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্যিক চিহ্ন। এই চিহ্নের নাম 'আধুনিক যুগ' এবং এই যুগের ভাবপরিমণ্ডলের নাম 'আধুনিকতা'। আর 'আধুনিক' করে তোলার সমগ্র তাত্ত্বিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার নামই 'আধুনিকায়ন'। তবে মনে রাখা জরুরি যে, ইউরোপীয় আধুনিকতার বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একই সময়পর্বে বা সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর 'অন্য' সব ভূখণ্ডে আধুনিকতার বিস্তার ঘটে নি। বাংলা অঞ্চলের সাপেক্ষে বলা যায়, ইউরোপে যে-রেনেসাঁস ঘটেছে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলা অঞ্চলে সে-রকম 'রেনেসাঁস' ঘটেই নি, যদিও উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক জাগরণকে কেউ কেউ রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি নাম দিতে চান।

আধুনিকতার এই সব লক্ষণ মোটেও সর্ববাদীসম্মত নয়। তাছাড়া বিশশতকে সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধ আধুনিকতার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কেই সন্দেহ উৎপাদন করেছে। তবু পঞ্চাশ-ষাটের দশকেই সমাজবিজ্ঞানে আধুনিকীকরণ বা আধুনিকায়নের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। মূলত তৃতীয় বিশ্বের অগ্রগতি ও উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে পাশ্চাত্যের আধুনিকায়ন তত্ত্ব (theory of modernization)। ম্যারিয়ন লেভি, হসেলিট্জ, রবার্ট বেলা, ডানিয়েল লার্নার প্রমুখ তাত্ত্বিক আধুনিকায়নের প্রধান ভাষ্যকার। সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা মূলত 'সনাতনী' অবস্থা থেকে 'আধুনিক'-এ উত্তরণের সামাজিক প্রক্রিয়াকে 'আধুনিকায়ন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

নন্দনতাত্ত্বিক আধুনিকতা সামাজিক আধুনিকায়নের এইসব লক্ষণের সঙ্গে সব সময় ঐকমত্য বজায় রেখে এগিয়ে চলে নি। আধুনিক যুগেই বিকশিত হয়েছে নন্দনতাত্ত্বিক আধুনিকতার তিনটি মুখ্য স্রোত — রোমান্টিকতাবাদ, বাস্তবতাবাদ ও আধুনিকতাবাদ। যুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে আধুনিক মানুষের আত্মচেতন শক্তির ওপর দাঁড়িয়েছিল রোমান্টিকতাবাদ। অন্যদিকে বিশশতকে চর্চিত আধুনিকতাবাদের স্রোতটি আধুনিকতার মানবকেন্দ্রিক, প্রগতিবাদী ও উন্নয়নকামী বৈশিষ্ট্যসমূহের অনেকগুলোকেই অস্বীকার করে। আবার *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* ও মার্কস-লেনিন-মাওবাদী প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রভাবে আধুনিকতার মানবমুক্তি, গণতন্ত্র-সংক্রান্ত বক্তব্যে পরিবর্তন এসেছে। রুশবিপ্লবের (১৯১৭) পর সক্রিয়ভাবে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কসবাদী বিপ্লবী ধারা।

২.২. *বিবিধ বিতর্ক*

আধুনিকতা বিষয়ক তাত্ত্বিক লেখাগুলোতে মূলত আধুনিকতার বহুরূপী মুখশ্রী ধরা পড়ে। দেখা যায়, আধুনিকতার ইতিহাস, নামকরণ ও পদ্ধতি — এই তিনটি ক্ষেত্রেই অসংখ্য বির্তক বিদ্যমান। মডার্নিজম, হাইপার মডার্নিটি, লেট মডার্নিটি, হাই মডার্নিটি, সুপার মডার্নিটি, পোস্ট-মডার্নিটি প্রভৃতি নামে আধুনিকতার নানামুখী বিস্তার কিংবা বিচ্যুতি। পোস্ট-মডার্নিটি বা উত্তর-আধুনিকতা তেমনই একটি তাত্ত্বিক কাঠামো, যদিও তা স্বনাম থেকে আধুনিকতার বর্ণগন্ধ মুছে ফেলতে সক্ষম হয় নি। এ-লেখায় আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের রূপরেখা খেয়াল করব।

ম্যালকম ব্র্যাডবুরি ও জেম্‌স ম্যাকফারলান লিখেছেন, 'Modernity, in normal usage, is something that progresses in company with and at the speed of the years, like the bow-wave of a ship; last years modern is not this year's.' (Bradbury and McFarlane, 1991 : 22) প্রচল কথার এই আধুনিকতা সময়বোধের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বিশেষ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত চিন্তার রূপকল্পকে বোঝায় না।

প্রাচীনপন্থিতা ও নবীনতাকে সামনে রেখে আধুনিকতা বিষয়ক তর্ক নতুন নয়। মধ্যযুগের ইউরোপে 'ancient' ও 'modern'-এর মধ্যকার তর্কের প্রচলন ছিল। তবে রেনেসাঁসের পর তর্কটি নতুন ব্যঞ্জনা পেতে থাকে। এই তর্কের দুটি বিষয় নির্ধারণ করেছেন জেরার্ড ডিলান্টি : প্রথমত, ১৭-১৮ শতকের 'প্রাচীন ও আধুনিকে'র তর্ক (ancients and moderns), দ্বিতীয়ত, বইয়ের লড়াই (battle of the books)। বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সাহিত্যের শৈলী ও ধ্রুপদী সাহিত্যের সম্পর্ক। (Delanty, 2000 : 8-9)। ডিলান্টির ভাষায় তখনকার আধুনিকরা এমন :

> The moderns were those who rejected classic style, such as the idea of timeless beauty or the reverence for the Augustan Age, in favour of the contemporary, which was characterized by a strong belief in science and progress. (Delanty, 2000 : 8-9)

ডিলান্টির বক্তব্যে আধুনিকতাবোধ ও সমকালীনতার পরস্পর-নির্ভরতা খুঁজে পাই। কিন্তু এই নির্ভরতার সম্পর্কটিকে ভিন্নভাবে দেখেছেন স্টিফেন স্পেন্ডার। তাঁর মতে, 'সমকালীনতা'র দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত, কিন্তু 'আধুনিকতা' সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাত। (Spender, 1965 : 77)। তিরিশের দশকের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে সামনে রেখে স্পেন্ডার দেখিয়েছেন যে, লেখকরা যখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তখন তাঁদের মধ্যে 'আধুনিক' হয়ে ওঠার চেয়ে বরং বেশি কাজ করেছে 'সমকালীন' হয়ে ওঠা। (Spender, 1965 : 77)

রোমান্টিকতাবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং বিযুক্তভাবেও আধুনিকতাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার এমন প্রশ্নও উঠেছে, আধুনিকতা মানেই আধুনিকতাবাদ বা আধুনিকবাদ কিনা। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসতত্ত্বের ভাবুক ও তাত্ত্বিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় আধুনিকতা ও আধুনিকবাদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> আধুনিকতা নামের যে বৃহত্তর ভাবধারা, মতাদর্শ, জীবনচর্চা, আধুনিকবাদ তারই অন্তর্গত এক বিশেষ আন্দোলন, যা আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের এক বিশেষ পর্বে দেখা দেয়। সাহিত্যে বা শিল্পে আধুনিক রীতি, শৈলী, আচার যখন বেশ একটা প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্য নিয়ে কায়েম হয়ে বসে, তখন তার বিরোধিতা করেই আধুনিকবাদের জন্ম। আধুনিকবাদ যেন আধুনিকতারই এক অন্তরঙ্গ সমালোচনা। সে চায় আধুনিকতাকে তার নিজস্ব নিয়মবাঁধা গণ্ডির বাইরে নিয়ে গিয়ে অন্য প্রভাব, অন্য আলাপ, অন্য অভিজ্ঞতায় উৎসাহিত করতে। (পার্থ, ২০০৮ : ১৫৫-১৫)

আর এই আধুনিকতাবাদের সঙ্গে ঘিরে আছে ইম্প্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম, ফিউচারিজম, সিম্বলিজম, ইমেজিজম, ভর্টিশিজম, দাদাইজম, সুররিয়ালিজমের মতো আরও নানারকম নন্দনতাত্ত্বিক আন্দোলন। লক্ষণীয় যে, বিশশতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মূলত আন্দোলনগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ। আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পান্দোলনে যে-সব কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলোকে ৬টি বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত করেছেন স্টিফেন স্পেন্ডার। তাঁর অনুসরণে সেগুলোর সার-সংক্ষেপ :

১. উপলব্ধি। নতুন শিল্পের মাধ্যমে আধুনিক অভিজ্ঞতার উপলব্ধি। কেননা শিল্পোন্নত নগর, যন্ত্র, বিজ্ঞানভাবনা জীবনযাত্রার বুননই বদলে দিয়েছে।
২. সমাজকে প্রভাবিত করে আশাবাদের রূপ উদ্ভাবন করা। বিশ্বকে বৈপ্লবিক করার মাধ্যমে আধুনিক শিল্প সমকালীন পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটাবে।
৩. এমন এক শিল্পের ধারণা দেয়া যা বাস্তবকে অন্তর্জীবনে রূপ দেবে এবং অন্তর্দৃষ্টিকে বাহ্যিক সমাজ-পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে রূপান্তরিত করবে।
৪. শিল্পকে উপভোগবাসনা ও যৌন অভিজ্ঞতার কাছাকাছি নিয়ে আসা। শিল্পের মাধ্যমে উগ্রতা, যৌনসম্পর্ক, পাগলামি, মাদকের প্রকাশ — শিল্পী এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করবেন যাতে করে এগুলোর সত্যিকার অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাওয়া যায়।
৫. বিচ্ছিন্নকরণ বা বিচূর্ণীকরণ। এটি মূলত দৃশ্যচিত্রমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত। তবু সাহিত্যে এর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, জেমস জয়েসের *ইউলিসিসে* ব্যবহৃত 'interior monologue' বা অন্তর্লীন মনোকথন। ইয়েটসের চিত্রকল্পে যেমন দেখা যায় ব্রোঞ্জের মাথাওয়ালা, পাখির মতো চোখের মানবীয় বা অতি মানবীয় মুখচ্ছবি যা মিশরীয় ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্ধেক-পাখি অর্ধেক-জন্তু আর মানুষের অবয়ব মিলেমিশে একাকার।
৬. ঐতিহ্যের বিপ্লবী ভাবনা। অর্থাৎ সমালোচনামূলকভাবে ঐতিহ্য-নির্বাচন কিংবা বলা যায় ঐতিহ্যের ব্যাঙ্গানুকৃতি। বোদলেয়ার যেমন ক্যাথলিক চৈতন্যকে বুঝেছিলেন শয়তান/অমঙ্গলের ধারণা দিয়ে। (Spender, 1965)

আধুনিকতা বিধ্বংসী সব বিতর্কের মুখে পড়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। আর তাই আধুনিকতা বলতে মূলত অবক্ষয়ের চিহ্নই ধরা পড়েছে মানুষের মনে। এ-কারণে আধুনিকতা প্রসঙ্গে নতুন ভাষ্য তৈরি হয়েছে উত্তর-আধুনিক, উত্তর-ঔপনিবেশিক ও নিম্নবর্গের ভাবুকদের কাছে। আধুনিকতার সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিকোণগুলো (যেমন : মানবতাবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ, মার্কসবাদ) ঘিরে প্রশ্ন তুলেছে উত্তর-আধুনিকতাবাদ। লিওতার যেমন মনে করেন মিথ বা শিল্প — আধুনিকতার এ-ধরনের মহাবয়ানে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে উত্তর-আধুনিকতার। লিন্ডা হাচিন দেখিয়েছেন উত্তর-আধুনিক পরিস্থিতিতে সাহিত্যের আঙ্গিকগুলো তাদের সীমানা ভেঙে ফেলছে কিংবা আঙ্গিকগুলোর মধ্যে চলছে জয় নির্ধারণের লড়াই। উত্তর-আধুনিকতার তাত্ত্বিক লিওতার আধুনিকতাকে দেখেছেন মহাবয়ান (grand narrative) হিসেবে; আধুনিকতা এমন এক মহাপ্রকল্প যা মানুষকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে ইতিহাসে মানবমুক্তির প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। (Readings. 1992 : 65)

আধুনিকতা-প্রকল্পের কয়েকটি ধরন, যেমন : এনলাইটেনমেন্টের আলোতে মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেবে, মার্কসবাদ প্রলেতারিয়েতকে মুক্তি দেবে শোষণের শৃঙ্খল থেকে, গণতন্ত্র জনগণকে মানবতাবোধের মূর্ত প্রতীকে পরিণত করবে কিংবা প্রযুক্তি-উন্নয়ন মুক্তবাজারের মাধ্যমে মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করবে। লিওতার দেখিয়েছেন যে, আধুনিকতার প্রকল্পসমূহ ভেঙে পড়েছে। মহাবয়ানের জায়গা দখল করেছে ক্ষুদ্র বয়ান বা আখ্যান (little narratives) — ক্ষুদ্র কিন্তু প্রতিরোধে সক্ষম।

'Modernity — An Incomplete Project'-এ হেবারমাস দেখিয়েছেন অর্থনীতির বিশেষায়িত জ্ঞান, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন, প্রাযুক্তিক জ্ঞান ও শিল্পকলা মানুষের দৈনন্দিন ও প্রায়োগিক জীবনের সপ্রাণ অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং জ্ঞানকাণ্ডগুলো ক্রমশ একক অধীশ্বর ও পেশাদারি হয়ে উঠেছে; ফলে জনমানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক দূরত্ববাচক। আধুনিক শিল্পকলার 'আধুনিকতাবাদ' নামের গণবিচ্ছিন্ন ও আভাঁগার্দ আন্দোলনটির দিকে তাকিয়ে হেবারমাস দেখেছেন নন্দনতাত্ত্বিক আধুনিকতার সেই প্রণোদনাও নিঃশেষিত, তাঁর ভাষায়, 'Modernism is dominant but dead.' (Habermas, 2001 : 1752)। হেবারমাস মূলত আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও রাজনীতির নতুন উদ্যম ও সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। তাঁর এই তাত্ত্বিক আগ্রহ সত্ত্বেও আজ আধুনিকতার নামে পরিচিত বিষয়াবলি ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী, বর্ণবাদী এবং আধিপত্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত। উপনিবেশিত দেশগুলোতে জেগে-ওঠা গণমুক্তির সংগ্রাম আধুনিকতার ভূমিতটে সজোরে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসকার পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাংলা অঞ্চলের আধুনিকতা সম্পর্কে লিখেছেন, 'মনে রাখতে হবে, বিশ্বজনীন আধুনিকতার প্রাঙ্গণে আমরা ব্রাত্য, চণ্ডাল। আমাদের কাছে সে আধুনিকতার মানে বিদেশি জিনিসের ফ্যান্সি মার্কেট। থরে থরে সাজানো রয়েছে। পয়সা ফেল, কিনে নিয়ে যাও। আধুনিকতার উৎপাদক হিসাবে সেখানে কেউ আমাদের পোঁছে না।' (পার্থ, ২০০০ : ১৮৪)। ঔপনিবেশিক শক্তির আধুনিকতা উপনিবেশিতের অঞ্চলে আলো হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আবার জাতীয়তাবাদী চিন্তাকাঠামো থেকে আধুনিকতার ভিন্ন রূপও ভাবা হয়েছে; পার্থ এই বিকল্প আধুনিকতাকে বলেছেন 'জাতীয় আধুনিকতা'। জাতীয় আধুনিকতার দৃষ্টি থাকে জাতীয় অতীতে। যে-অতীত হয়ত কিছুটা কাল্পনিক; কিন্তু এই অতীতের ঝোঁক থাকে প্রতিরোধের। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধের দিক থেকেও আধুনিকতাকে বোঝা যেতে পারে।

২.৩. *কবিতা ও আধুনিকতা*

তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণ ও ভাষ্য থেকে বুঝতে পারি আধুনিকতা বিষয়ক ভাবনা কোনো সুনির্দিষ্ট গতিরেখায় এগিয়ে যায় নি; স্থান, কাল, অঞ্চলভেদে কিংবা বলা যায় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতার কারণে আধুনিকতা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র গ্রহণ করেছে। কবিতার আধুনিকতাও একার্থক কোনো মানদণ্ড দ্বারা চালিত হয় নি। এলিয়টের উদাহরণে বলা হয়ে থাকে আধুনিক কবিতা ব্যক্তির প্রস্থানের ভেতর দিয়ে সূচিত। রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখেছেন আধুনিক কবির 'বিষয়ীর আত্মতা' নয় বরং 'বিষয়ের আত্মতা'ই মুখ্য। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭

: ৪৬৬)। কিন্তু রিলকের কবিতায় ব্যক্তিই চরম আরাধ্য। এলিয়ট যেখানে প্রুফকের নামে সমকালীন চিত্তসংকটকে হাজির করেছেন, *দুইনো এলিজিতে* (১৯২৩) সমকালীন জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে রিলকে নিজেই হয়ে উঠেছেন কবিতার বিষয়।

উনিশ শতকী রোমান্টিকতাবাদের প্রতিরোধ করে বলা হয়, আধুনিক কবিতায় কল্পনার অধিষ্ঠান নেই, অথচ জীবনানন্দ দাশ কবির ইমাজিনেশন বা কল্পনাপ্রতিভার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন জোরালোভাবে, কবিতায় চেয়েছেন 'মানুষের মনের চিরপদার্থের' উপস্থিতি। (জীবনানন্দ, ২০০০ : ১০৬)। কল্পনার মতো প্রেরণাবাদের মূল্যমানও আধুনিক কবিতায় হ্রাস পেয়েছে বলে মত প্রকাশ করা হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) জীবনদেবতা নামক অধরা এক শিল্পধাত্রীর করতলে সমর্পিত। স্বদেশের সমকালীন সংকটে লোকপুরাণ, গাথার প্রয়োগে ইয়েটস যে-রকম জাতীয় আবেগের উৎসারণ ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রকাব্যে তার অনুপস্থিতি লক্ষ্যযোগ্য, যদিও সাহিত্যের অপরাপর মাধ্যমে, বিশেষ করে, উপন্যাস ও প্রবন্ধে জাতীয় অনুভূতি প্রশমিত থাকে নি। একই অনুভূতি নজরুলের (১৮৯৯-১৯৭৬) কবিতায় প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে স্বয়ম্প্রকাশিত। রাবণ ও মেঘনাদের রূপকতায় কিংবা চতুর্দশপদীর মিতবন্ধনে মধুসূদন তার রূপ দিয়েছেন উনিশ শতককেই। *মেঘনাদবধ কাব্যের* (১৮৬১) কলাপ্রকৌশল ধ্রুপদী; এবং একে নব্যধ্রুপদীচেতনার সঙ্গেই হয়ত তুলনা করা যেতে পারে। তবে এটিও আধুনিকের মহিমা নিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা কবিতার ইতিহাসে। অথচ ক্লাসিকতার সঙ্গে আধুনিকের বিরোধ প্রকট। ধ্রুপদী কবিতা শিল্পের প্রাচীন কাব্যশাস্ত্র-নির্ধারিত গাঁথুনি মান্য করে চলে, আধুনিক তা অগ্রাহ্য করে। রোমান্টিক কাব্যের প্রতিভূরাও তা মানেন নি। বাংলা কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দ (১৯০১-১৯৬০) ও শব্দব্যবহারে একেবারেই সাবেকী — অচল মুদ্রার মতোই প্রাচীন শব্দকে সংস্কার করে তিনি উজ্জ্বল করে তুলতে আগ্রহী। জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) গীতিকাব্যিক সারল্যের পাশে সুধীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে শিলায়িত ব্যতিক্রম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপক রক্তক্ষয় ও ধসের মুখে পড়ে অনেক কবিই বিমানবিকতার কথা বলেছেন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিও কবিদের উদ্দীপিত করেছে। রিলকে-ব্যবহৃত এঞ্জেলের স্বরূপে নিটশের সুপারম্যান ধারণার অভিপ্রকাশ লক্ষ করা যায়; এই এঞ্জেল অস্তিত্ব রক্ষায় মানুষের সাধারণ দক্ষতাসীমার অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করে। প্রায় একই রকম ভাবনার খোঁজ পাওয়া যায় নিটশের (১৮৪৪-১৯০০) 'সুপারম্যানে'র ধারণায়। সার্তে (১৯০৫-১৯৮১) বা হাইডেগারের (১৮৮৯-১৯৭৬) অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলার নজির বিশ শতকের কবিতায় সুপ্রচুর। অন্যদিকে ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মন ও যৌনতা সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ আধুনিক কবিদের চৈতন্যে ঢেউ তোলে নি এমন পরিস্থিতি কল্পনা করাও কঠিন।

অবক্ষয় ও অবসাদ আধুনিক কবিতার এক সাধারণ প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। এলিয়ট যেমন কফির চামচে জীবন মাপার তুলনা টেনেছেন, ইয়েটস যেমন শুনিয়েছেন কেন্দ্র ভাঙার শব্দ। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতায় দেখেছেন, 'আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিনতা ও বহির্মুখিনতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা।'

(বুদ্ধদেব, ১৯৮৩ : আট)। বোঝা যায়, কবিদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে আত্মদ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতা। এজরা পাউন্ড যুদ্ধে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের একীভূত থাকার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছিলেন। মূলত যুদ্ধকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন; সেই এজরা পাউন্ডই গিয়েছেন বিমানবায়নের বিপক্ষে, সভ্যতার প্রশংসায় হয়েছেন পঞ্চমুখ। আবার যেন ফিরে এসেছে আস্থা। উদার মানবতাবাদীরা যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী ভূমিকায় নেমেছিলেন। অথচ বঙ্গদেশের রবীন্দ্রনাথ চিরকালই মাঙ্গলিকতার পক্ষে। মঙ্গলবোধের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিতার সমালোচনা করেছেন, 'আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল-ঠোকাই আধুনিকতা।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৬৮)

মায়াকোভস্কি মানুষের সম্ভাবনার মুহূর্তগুলোকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন কবিতায়। রুশবিপ্লবে কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছিলেন ইতিবাচকতার আশ্বাস। তাই নেরুদা শুনিয়েছিলেন প্রগতির জয়ধ্বনি। মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম ও বিপ্লবের তত্ত্ব কবিদের দার্শনিকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। পল এ্যলুয়ার কিংবা আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২) স্বপ্নঘোর, অস্পষ্ট পরাপৃথিবী থেকে কামনা করেছেন নির্বাণ। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার আধুনিক কবিরা ঔপনিবেশিকতা, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন মার্কসের বিপ্লবী দর্শনের সান্নিধ্যে। কৃষ্ণত্ববাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আফ্রিকার নিজস্ব আধুনিকতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এমে সেজায়ার, লিওপোল্ড সেঁদর সেজ্ঘর (১৯০৬-২০০১)। অবক্ষয়ের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে গড়ে ওঠা আধুনিকতার এ-ধরনগুলোকে কেউ কেউ বলেছেন 'বিপ্লবী আধুনিকতা'। (অশ্রুকুমার, ১৯৯৪)। এটিকে আবার অনেকে আধুনিকতাবাদের সঙ্গে যুক্ত রাখতে অনিচ্ছুক।

ঔপনিবেশিক ইতিহাসের অংশী এই বঙ্গদেশে সাহিত্য আধুনিকতাবাদের সাক্ষাৎ পেয়েছে মাত্র একশ বছরের নন্দনতাত্ত্বিক প্রস্তুতিতে, সমাজ যদিও প্রস্তুত নয়। উনিশ শতকেই আমরা দেখব ধ্রুপদী প্রবণতা (মধুসূদন, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র), রোমান্টিকতাবাদ (বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ), সমকালীন বাস্তবতাবোধ (ঈশ্বর গুপ্ত) প্রভৃতি। ইউরোপের স্তরান্তরের সঙ্গে মিলিয়ে এই বিকাশকে পাঠ করা যায়। ইউরোপ শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লবের ভাবনাপুঞ্জের আশ্রয়ে উদার মানবতাবাদী ও পুঁজিনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতির দিকে এগিয়ে গেছে। বঙ্গদেশ তখনও সামন্তবাদী ব্যবস্থার অধীন, ক্ষমতায় আসীন ঔপনিবেশিক প্রভুরা। এমন বাস্তবতায় বাংলা কবিতার ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ধ্রুপদী চেতনা, বাস্তবতাবাদ ও রোমান্টিকতাবাদের কোলাজ। সাহিত্যের আধুনিকতা নির্ণয় একটি ঐতিহাসিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেবেশ রায় দেখিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রান্ত ও প্রতিপক্ষ দুটি : একদিকে ঈশ্বর গুপ্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্র, অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দেবেশ, ২০০৩ : ২০)।

রবীন্দ্র-উত্তর তরুণ বাঙালি কবির আধুনিকায়নে সংকট রবীন্দ্রনাথ। ভাস্বর রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমণের আবেগ আত্মসাৎ করে নিয়েছে তৎকালীন ইঙ্গ-আমেরিকান সাহিত্যিক তৎপরতাকে। বিরোধিতা এসেছে দুদিক থেকেই; উদার মানবতাবাদীরা বললেন রবীন্দ্রনাথ সেকেলে, মার্কসবাদীরা বললেন বুর্জোয়া সভ্যতার প্রতীক। মার্কসবাদ ঘরানার কবিরা দু-হাত ভরে নিয়েছেন বিপ্লব-উত্তর রাশিয়ার সাহিত্যিক রাজনীতি। তবু দুই মার্কসবাদী — আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যখন প্রকাশিত হল *আধুনিক বাংলা কবিতা* (১৯৪০) তাতে রবীন্দ্রনাথই পেয়েছেন প্রথম স্থান। বুদ্ধদেব বসুর *আধুনিক বাংলা কবিতা* (১৯৫৪) সংকলনের আরম্ভও হয়েছে রবীন্দ্রকবিতার মাধ্যমে। স্ববিরোধী সয়ীদ আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবণতা নির্ধারণ করেছেন 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী' এবং 'ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী' হিসেবে। (সয়ীদ, ১৯৯৯ : ৮)। সাবেক রবীন্দ্রবিরোধীরা ফিরে গেছেন রবীন্দ্রনাথেরই শিল্পভূমিতে। কট্টর রবীন্দ্রবিরোধী বিষ্ণু দে *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা* নামের একটি পুরো বইতে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক চিত্ত-স্বভাবের পরিচয় উদ্ধার করেছেন।

৩. 'পূর্ববঙ্গ' থেকে 'বাংলাদেশ' : সমাজ, রাষ্ট্র, আধুনিকতা ও সাহিত্য

আধুনিকতার তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার, বাংলাদেশে কোন সমাজ-রাষ্ট্রিক পরিবেশে আধুনিকতার বিস্তার ঘটেছে? আধুনিকতার নান্দনিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক স্রোতধারা একই খাতভুক্ত কিনা? কিংবা কীভাবে প্রস্তুত হলো আধুনিকতার সাংস্কৃতিক পটভূমি? এ-লক্ষ্যে আমরা দেখে নিতে চাই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস — যে-ইতিহাস সমাজকাঠামো, রাজনীতি ও রাষ্ট্র-সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আধুনিকায়ন কেবলই পঞ্চাশ বছরের ঘটনা নয়; আধুনিকতাকেন্দ্রিক আয়োজন সুদীর্ঘ কালের। উনিশ শতকের কলকাতায় তখন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাব চলছে। সেই প্রভাবসূত্রে গড়ে উঠছে আধুনিক বঙ্গীয় সমাজ। সাহিত্যিক আধুনিকতার যেমন আরম্ভ, তেমনি সূচনা সাংস্কৃতিক আধুনিকতারও।

৩.১. *মধ্যবিত্ত মন*

উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবাংলা এবং ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার তুলনা এক্ষেত্রে জরুরি। তুলনার কারণ, প্রথমত, ঢাকার প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও কলকাতা সমৃদ্ধির উচ্চতর ধাপে পৌঁছেছে, দ্বিতীয়ত, ঢাকা কলকাতার আধুনিক বিকাশ-ইতিহাসের আদিরূপ (prototype) গ্রহণ করেছে, তৃতীয়ত, ঢাকা ও কলকাতা বাংলার রাজনীতিতে একে অপরের ঐতিহাসিক যুগ্মবৈপরীত্যে পরিণত হয়েছে, আজও যা সচল ও কার্যকরি।

পশ্চিমবাংলায় বিকশিত হয়েছে কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং গড়ে উঠেছে বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডল। উনিশ শতকের কলকাতামুখী 'নবজাগরণে'র কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন : হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, হেয়ার কলেজ, বেথুন কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকায়নে নেতৃত্ব দান করেছে। অবশ্য বাস্তবতা

এমন নয় যে, ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শতাড়িত আধুনিকায়ন কলকাতায় অব্যাহতভাবে সংঘটিত হয়েছে। সত্যিকার অর্থে, 'প্রগতিশীলতা' ও 'রক্ষণশীলতা'র বিভাজন ছিল শুরু থেকেই। এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, উনিশ শতকেই মানবতাবাদ, জাতীয় চেতনা, বিজ্ঞানভাবনা, আত্মচেতনা, স্বাদেশিকতা, মানবাধিকার প্রভৃতি ভাবনার তাৎপর্যপূর্ণ উত্থান ঘটেছিল এবং এ-সবের নেতৃত্বে ছিলেন বাঙালি হিন্দু ও ব্রাহ্ম মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীগণ। কিন্তু কেমন ছিল উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত?

শিক্ষা ও জ্ঞান, যুক্তি ও বিজ্ঞান, আত্মবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সাম্য-মুক্তি ও স্বাধীনতা, মানবকেন্দ্রিকতা ও মানবতাবাদ, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, বৈশ্বিকতা ও মানবাধিকার, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মানদণ্ড ও উপলব্ধির আশ্রয়ে সংস্কৃতির যে-রকম আধুনিকায়ন কলকাতায় ঘটেছে, ঢাকায় সে-রকম ঘটেনি বরং বলা যায় বিলম্বিত। বিলম্বের কার্যকরণ নিহিত ঔপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ভেতর।

মুসলমানের পক্ষ থেকে ইংরেজি ভাষাকে বলা হয়েছে 'কুফরি কালাম', পাশ্চাত্য জ্ঞানকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'এলমে বেদিন'। তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি মুসলমান সহযোগিতা প্রদানের নীতি গ্রহণ করে। এই নীতির ফলেই মুসলমানরা ইউরোপীয় ভাবাদর্শে শিক্ষালাভে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সমকালীন শিক্ষায় দীক্ষিত মুসলমান জমিদারদের কেউ কেউ মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার সম্প্রসারণে ভূমিকা রেখেছেন। এঁরা যেমন উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তেমনি সম্পৃক্ত ছিলেন বিভিন্ন সভা, সমিতি ও পত্রিকার সঙ্গে। ফলে হিন্দু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আদলে গড়ে উঠতে থাকে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসূচি সমধর্মী নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য সমরূপ—বাঙালি মুসলমানের জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিকতার পথ উন্মুক্ত করা।

৩.২. *জনপদ, সমাজ, সংস্কৃতি*

ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক কারণে পূর্ব বাংলা প্রান্তিকীকরণের শিকার। অখণ্ড বাংলার এই পূর্বভূমি প্রাকৃতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিকূলতা উজিয়ে ১৯৭১-এ একটি সুস্থিত আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো পেয়ে গেছে। তার পূর্ব-ইতিহাস অবহেলা ও প্রান্তিকতার, লড়াই ও সংগ্রামের। উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জনপদ ছিল অরণ্যসঙ্কুল। সিভিলিয়ানদের ভাষায় রোগশোকের শহর, কেউ বলেছেন রহস্য-নগরী। ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মনে করত চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা একটি শাস্তিকেন্দ্র। কলকাতার তুলনায় ঢাকা ছিল নিতান্ত মফস্বল। মূলত উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গ কৃষি ও গ্রামীণ সংস্কৃতিনির্ভর। নদীবর্তী অঞ্চল হওয়ায় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল জলপথ। প্রদেশ হিসেবে পূর্ববঙ্গ এবং নগর হিসেবে ঢাকা গুরুত্ব পেতে আরম্ভ করে ১৯০৫-এর দিকে, বঙ্গভঙ্গের কালে। পূর্ববঙ্গে আধুনিক ভাবনা বিকাশের প্রধান প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষক পরিবার থেকে আসা মধ্যবিত্তের বিকাশ-ইতিহাসটিকে স্মৃতিচারণায় গেঁথে রেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রথম সভাপতি এ.জি. স্টক :

> যে-কৃষকটি তার ছেলেকে ইংরেজি শিক্ষা দেবার প্রয়োজনে যতটা পারছে ততটা ইঞ্চি জমি বিক্রি করে দিচ্ছে, সে প্রত্যাশা করে যে, ছেলে শিক্ষিত হলে সরকারি অফিসে কাজ পাবে অথবা কলকাতার কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে এবং বাড়িতে সামান্য হলেও নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারবে, অন্তত, নিজেকে সে ফসল তোলার দৈব সুযোগের ওপর আর নির্ভরশীল রাখবে না। এদিকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ছেলেটি শেখে ইউরোপিয়ান সুট পরতে, হোটেলে-রেস্তোরাঁয় যে-গান বাজে তার সুর ভাঁজতে, যখনি সাধ্যে কুলায় একটি ইংরেজি ছবি দেখতে ও হলিউডি অশ্লীল বুলি আওড়াতে। যখনই সে বাড়ি আসে ইংরেজি শিক্ষার এইসব প্রমাণাদি ওকে গ্রামের লোকের কাছে প্রশংসনীয় ও শ্রদ্ধেয় করে তোলে। (স্টক, ২০০১ : ৪৪)

পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ছিল ঢাকা। কিন্তু ঢাকার নাগরিক অবয়ব তৈরি হয়েছে বেশ দেরিতে। ১৯৪৭ সালের পর তেজগাঁ, ডেমরা, আদমজি নগর ও টঙ্গীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। শিল্পের বিকাশ যখন ঘটতে আরম্ভ করেছে তখন পুরনো নগরের অবয়বেও পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। আর নগরের উন্নয়নভোগী অধিবাসীরাই হয়ে উঠেছে আধুনিকতার প্রতিভূ। এদের ভাবাদর্শ মূলত পাশ্চাত্যশাসিত। এমনকি পল্লি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও কাজ করেছে এই পরনির্ভরশীলতার ছক। অর্থনৈতিক এই নির্ভরশীলতা অধিকাঠামোর নির্ভরশীলতাকে যৌক্তিক করে তুলেছে।

হামজা আলাভীর বিশ্লেষণ থেকে আরেন্স ও ব্যুরদেন দেখিয়েছেন, সামন্ত অর্থনীতির অবশেষ এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির উত্থান — এই দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপাদান বাংলাদেশে (সত্তর দশক) সহাবস্থান করেছে; শ্রেণিস্বার্থের প্রয়োজনে জোতদার ও উঠতি বুর্জোয়ার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় নি। (আরেন্স ও ব্যুরদেন, ১৯৯৮ : ১৬৯)। আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিদেশি নির্ভরশীলতা ক্রমশ বেড়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের ব্যর্থতার সূত্রে এ-ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি সুযোগ লাভ করেছে।

৩.৩. *সাহিত্যের পরিসর : কবিতা ও আধুনিকতা*

বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানের আধুনিক বিকাশ-ইতিহাসের আদিরূপ একই ধরনের। দুই গোষ্ঠীর সম্মিলিত অগ্রযাত্রা পুনরুত্থানবাদী (revivalist); ফলে অসাম্প্রদায়িক চৈতন্য অর্জনে ব্যর্থ। আবার ধর্মভেদে যে-প্রান্তিকতা মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির ভেতরমহলে কার্যকরি ছিল, অঞ্চলভিন্নতা বা কেন্দ্রদূরবর্তিতার জন্য সেই প্রান্তিকতা দেখতে পাই পূর্ব বাংলার বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতিতেও। আর তাই তাঁরাও কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের আদিরূপ গ্রহণে উৎসাহী।

এমনই আদিরূপের সন্ধান করেছিল ঢাকার *বান্ধব* (আষাঢ় ১২৮১); পত্রিকাটিকে বিবেচনা করা হত কলকাতার *বঙ্গদর্শনের* প্রতিরূপ, 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন'। কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত *বান্ধব* পত্রিকাকে ঘিরে গড়ে ওঠে ঢাকার বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষিতজনের সাহিত্য-আড্ডা। মূলত 'ঢাকায় দীর্ঘকাল জারিগান ও শাহমাদারের গানের পাশাপাশি মনসা-মঙ্গলের পালা, কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়, নীলের গান, ভাটের গান, কবির গান প্রভৃতি ঢাকার রসিকজনের আনন্দের উৎস ছিল।' (কাইউম, ১৯৯০ : ৯)। অন্যদিকে 'ঢাকার আদিবাসী ও বিত্তবান

মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন নবাবরা, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার চর্চা ছিলো না, তাঁরা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন না, তাঁদের ভাষা ছিলো উর্দু বা ফারসি, ইংরেজি বা বাংলা নয়। এ সব পরিবারের অনেকে সাহিত্যচর্চা করতেন উর্দু বা ফারসিতেই।' (আবুল, ১৯৯০ : ১৯)। এছাড়া ছিল পুঁথিসাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার। এসব পুঁথি 'পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মুসলমানের রসপিপাসা' মিটালেও এই শিল্পরুচি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঔপনিবেশিক শিল্পরুচির সঙ্গে খাপ খায় নি। (কাইউম, ১৯৯০ক : ৯)

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও অভিজ্ঞ মুসলমান লেখকদের বেশির ভাগই ছিলেন কর্মসূত্রে ঢাকার বাইরে, কেন্দ্রের টানে কলকাতায়। প্রভাবশালী পত্রিকাসমূহের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে থাকে ঢাকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত *কবিতাকুসুমাবলী* বাংলা ভাষার প্রথম কবিতাপত্র। হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *অবকাশরঞ্জিকা* (১৮৬২), *ঢাকা দর্পণ* (১৮৬৩), *মিত্রপ্রকাশ* (১৮৭০) প্রভৃতি পত্রিকা। *মিত্রপ্রকাশে*'র লক্ষ্য ছিল বঙ্গভাষার উন্নতি, তবে '*মিত্রপ্রকাশে* কলকাতার শীর্ষস্থানীয় ও প্রখ্যাত লেখকরা নন পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক লেখকরাই লিখতেন।' (আবুল, ১৯৯০ : ৪৫)। স্বাদেশিকতার প্রতিফলনে লেখা সম্পাদকীয়তে পত্রিকার উদ্দেশ্য, 'বাংলার প্রতি যাহাতে বাঙ্গালীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থে ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে।' (কালীপ্রসন্ন, ১৯৯০ : ৩৪)

বাঙালি মুসলমানের পুঁথিচর্চা এবং বাঙালি হিন্দু-ব্রাহ্মের সাহিত্যসাধনা উনিশ শতকের ঢাকায় বড় ধরনের কোনো সাহিত্যিক আলোড়ন তৈরি করতে সক্ষম হয় নি। মুসলমান সমাজে যতোটুকু পরিবর্তনের ঢেউ এসেছিল ততোটুকু বহিরাগত, কলকাতাসূত্রে ঢাকায়। ঢাকা তখনও সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র হয়ে ওঠে নি। তবু বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকায় সাহিত্যিক তৎপরতা লক্ষ করা যায়। অনুপম হায়াৎ দেখিয়েছেন, ১৯১১-তে 'পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্যকে সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য ঢাকায় গঠিত হয়েছিল 'ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ'।' (অনুপম, ২০০১ : ৪২)। এ-সংগঠনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে সচিত্র মাসিক পত্রিকা *প্রতিভা*; সংগঠনের লক্ষ্য : 'ঢাকাবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃভাষার সেবা'। (অনুপম, ২০০১ : ৪৩)। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর আদলে পূর্ব বাংলায়ও সাহিত্যের জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক যে-মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো সেই শ্রেণির লেখক-বুদ্ধিজীবীরাই সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজকে আলোড়িত করল; বিশেষ করে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাবনায় নতুন চিন্তার উপাদান জোগাল। ইতিহাসে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন নামে খ্যাত এই সংঘ থেকে প্রকাশ পায় *শিখা*। এই *শিখা*র মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের প্রগতিশীল চিন্তাকাঠামো প্রসার লাভ করে। এ-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের রেনেসাঁ ও আলোকপর্ববাহিত চিন্তাভাবনার একটি পূর্ববঙ্গীয় রূপ।

আর এই ঢাকায়-ই সচল ছিল আধুনিক সাহিত্যের ভিন্ন আয়োজন; প্রতীচ্যের জ্ঞান-বুদ্ধি-শিল্পজাত উপলব্ধির সমন্বয়ে বুদ্ধদেব বসু-অজিত দত্ত *প্রগতি* (১৯২৭) পত্রিকায় গড়ে তুলছিলেন আধুনিকতার তরুণতর প্রবাহ। অবশ্য *প্রগতি*-তে আধুনিক সাহিত্যের স্বভাবস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে কোনো সুসংগঠিত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে নি। সাধারণভাবে আধুনিকতার অর্থ ছিল অশ্লীলতা, বিদেশি কবিতার প্রভাব এবং 'প্রেম-বিরহ, নরনারীর দেহজ সম্পর্ক, সংশয় ও নৈরাশ্য, বিরূপ পরিবেশে আত্মহননের আভাস — এই সবের যেকোনো একটি বা একাধিক বিষয়ের প্রতিফলনের ভিত্তিতেই অনেক সময় কবিতার আধুনিকতা চিহ্নিত হতো।' (কিরণশঙ্কর, ১৯৯৪ : ৫৩)। *প্রগতি* পত্রিকার একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের *কল্লোল* পত্রিকার সখ্য গড়ে ওঠে এবং এতে করে পশ্চিমবঙ্গীয় আধুনিকতার আদলটি ঢাকায় প্রভাব ফেলতে থাকে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী এ-সময়কার সাহিত্যিক পটভূমি প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণায় লিখেছেন :

> ...পূর্ববঙ্গের দল একভাবে কলিকাতার দল অন্যভাবে। পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য অনুকরণহীনতা ও নিজস্ব আদিরসের পরিবেশন ভিন্ন নূতন কিছু ছিল না। কিন্তু শিক্ষার অভাবে বা অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা নিজেদের রচনাকে মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া ঘোষণা করিতেন।
> কলিকাতার দলের সাহিত্যপ্রচেষ্টা অন্য ধরনের হইয়াছিল। এই দলের লেখকদের পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল। তাঁহারা টি.এস.এলিয়ট, হপকিনস্ প্রভৃতি অতি আধুনিক ইংরেজ লেখকের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের মতো হইতে চেষ্টা করিতেন, কি পদ্যে কি গদ্যে। (নীরদচন্দ্র, ২০০০ : ৬৬৯)

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের সুযোগ আছে; কিন্তু উনিশ শতকের মতোই বিশ শতকের প্রথম দিকের বৈশিষ্ট্য এই যে, কলকাতা ও পূর্ববঙ্গের লেখকপরিমণ্ডলে আধুনিকতা সম লয়ে বিকশিত হয় নি। কবিতায় আধুনিকতার স্বকীয় রূপ নিয়ে সক্রিয় থাকতে পেরেছেন খুব কম-সংখ্যক কবিই। পূর্ববঙ্গীয় কবিদের কাব্যচিন্তা এবং প্রায়োগিক সূত্রসমূহের ভরকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মধুসূদন, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের অভিঘাত দ্বারা। আর এরই মধ্যে ১৯২২-এ *অগ্নিবীণা* নিয়ে আবির্ভূত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁকে পাওয়া গেল বাঙালি মুসলমানের আদর্শ হিসেবে। পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্র মুদ্রার কাব্যস্বভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হন জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬); তাঁর *রাখালী* (১৯২৭), *নক্সীকাঁথার মাঠ* (১৯২৯) কাব্য দু'টি ব্যতিক্রমী আধুনিক। বাঙালি মুসলমানের কাব্যধারা এবং নজরুল-জসীমউদ্‌দীনের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত ছোট একটি মন্তব্যে হবীবুল্লাহ্ বাহারের বিবেচনা (১৯৪১) :

> পুঁথি-সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য হইতে রস সঞ্চয় করিয়া যে সাহিত্য তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সঙ্গে সমাজের নাড়ীর সম্বন্ধ খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা সম্বন্ধে উঁহারাই আমাদের মনে সকলের আগে আশার সঞ্চার করিয়াছেন। (হবীবুল্লাহ, ১৯৭১ : ৪৩৯)

পূর্ব বাংলার কবিতায় এই দুই ধারার অনুকারী গোষ্ঠী তৈরি হলেও স্থায়িত্ব লাভ করে নি। বাঙালি মুসলমানের শব্দসম্পদ ও গীতিকার আখ্যানধর্মের সুমিত সম্মিলন ঘটেছে ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) *সাত সাগরের মাঝি* (১৯৪৪) কাব্যে। আহসান হাবীব

(১৯১৭-১৯৮৫) কিছু কবিতায় পুঁথির ভাষাপ্রকরণ ব্যবহার করেছেন ব্যঙ্গাত্মক আবেদন তৈরি করতে। আবুল হোসেনের (১৯২২-২০১৪) মতো তিনিও মূলত তাড়িত ছিলেন তিরিশি আধুনিকতার দ্বারা। পুঁথি সাহিত্যের আধুনিক প্রয়োগে বিশ্বাসী সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) লিখেছেন *চাহার দরবেশ* (১৯৪৫)। কিন্তু তাঁরও অন্তিম অর্জন তিরিশি আধুনিকতার প্রত্নছাপ।

চল্লিশের দশকে পূর্ব বাংলার কবিতার মৌল ধারা ছিল পাকিস্তানবাদী আদর্শনির্ভর। মুসলমানী জাতীয় চেতনা, পাকিস্তান রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে শিল্পাদর্শ। দেশভাগ-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় এবং কমিউনিস্ট বিরোধিতার কালে প্রগতিচেতনার প্রসার ব্যাহত হয়। ফলে পাকিস্তানবাদী জাতীয় চেতনায় উন্মথিত হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার কবিতাভুবন।

একুশে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) সংকলনে সাহিত্যকে মাধ্যম করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে-বিকাশ-সম্ভাবনা ধ্বনিত হয়েছিল তারই এক কাব্য-রাজনৈতিক বিস্তার ঘটেছে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-৭৫), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর (১৯৩৪-২০০১) কবিতায়। অবশ্য বাঙালি লেখকদের মাধ্যমে বায়ান্ন-পরবর্তীকালেও উৎসারিত হয়েছে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের আদর্শ; মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ (১৯৩৬-২০১৩) যেমন তৎকালীন সাহিত্যে পাকিস্তানি জাতীয় আদর্শ, ইসলামী সংস্কৃতি, মুসলমান সমাজ, পুঁথি ও গাথা-কাহিনীর নবরূপায়ণ ও উপযোগিতা কামনা করেছেন। আধুনিকতার আকাঙ্ক্ষা এ-ধারার কবি-লেখকদের মধ্যেও ছিল, এমনকি আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ ছিল সুস্পষ্ট; 'সাম্প্রতিক সাহিত্যের ভাবধারা' (১৯৬১) শীর্ষক লেখায় তিনি বলেছেন :

> আধুনিকতা বলতে যা' বোঝানো হয়ে থাকে তার সঙ্গে ইতিহাস-চেতনা ও সময়-সজ্ঞানতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। আধুনিকতা কোনো একটি আরোপিত বৈশিষ্ট্য নয়, তা অন্তঃপ্রকৃতিতে জড়িয়ে না থাকলে কোনক্রমেই আধুনিক নামের উপযোগী হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির কথা স্বাভাবিকভাবেই আসে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা আজোও অনেকটা সামন্ততান্ত্রিক এবং অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে নগর-সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কৃষি-অর্থনীতির স্থান দখল করছে শিল্প-অর্থনীতি। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আধুনিকতা-প্রয়াসী হয়েও দ্বন্দ্বে বিজড়িত। সাম্প্রতিক সাহিত্য-শিল্পে এ দ্বন্দ্বের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অবশ্যই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হতে হবে; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আধুনিকতার আপাততঃ ঔজ্জ্বল্যে বিভ্রান্ত হয়ে আত্মবিধ্বংসী পথে পা বাড়াতে হবে। এ পথে এগিয়ে যাবার অর্থ নিজের অপমৃত্যুকেই ডেকে আনা। (মাহ্ফুজউল্লাহ, ১৯৬১ : ৭)

আন্তর্জাতিকতা, ইতিহাস-চেতনা, সময়-সজ্ঞানতা, নাগরিকতা, আত্মচেতনা আধুনিকতার এই সব তাৎপর্যবাহী অর্থ সত্ত্বেও পাকিস্তানি আদর্শবাদীদের আধুনিকতা পূর্ণায়তরূপে বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হয় নি। কেননা বাঙালির জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা অবধারিতভাবে পাকিস্তানবাদীদের চর্চিত আধুনিকতার সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে এবং ওই আদর্শকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে কাব্যতাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটেছে প্রধানত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিদের মাধ্যমেই। প্রতীচ্যের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য বেড়েছে, পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ তৈরি হয়েছে। আধুনিকতার প্রগতিবাদী, কল্যাণমুখী ও মঙ্গলকামী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে কবিতা হয়ে উঠেছে হতাশার, নৈরাশ্যের, নেতিবাচকতার। কবিতার ভাষা ও রূপে বিপর্যয়কারী নিরীক্ষা দেখা গেল। সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫), শহীদ কাদরী (১৯৪২), সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২-২০০৫), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০), রফিক আজাদ (১৯৪৩), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫), আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫), হুমায়ুন আজাদের (১৯৪৭-২০০৪) কবিতায় নিরীক্ষার এই ধরনগুলো তীব্র। ষাটের দশকে প্রকাশিত *সমকাল*, *পূর্বমেঘ*, *পরিক্রম* প্রভৃতি পত্রিকার পৌরোহিত্যে উদার আধুনিকতার যে-স্রোতধারা বহমান ছিল, তার পাশেই প্রতিবাদী, প্রথাবিনাশী ও বহির্দেশীয় কাব্যতত্ত্বের চিত্তবাহক রূপে কাজ করেছে ছোটকাগজ *স্বাক্ষর*, *কণ্ঠস্বর* (১৯৬৫), *না*, *বক্তব্য*, *সাম্প্রতিক* এবং প্যাম্পলেট *যুগপৎ* ও *স্যাডজেনারেশন* প্রভৃতি।

*সমকাল*কে (১৯৫৭) বলা যায় বাংলাদেশের সাহিত্যের আধুনিকায়নের মুখপত্র। বাংলাদেশের সাহিত্যের লক্ষ্য ও সম্ভাবনা, বৈচিত্র্য ও বিকাশের পথ খুঁজেছে *সমকাল*। বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ও অখণ্ড ইতিহাস থেকে নিজেদের বিচ্যুত করে পুঁথিসাহিত্য বা ইসলামি ঐতিহ্য-আশ্রয়ী যে-খণ্ডিত ও একরৈখিক ঐতিহ্য নির্মাণের প্রয়াস চলছিল তার বিরোধিতায় *সমকাল* পালন করেছে অগ্রবর্তীর ভূমিকা। পত্রিকাটি তাই বাঙালির জাতীয়তাবাদী সাহিত্য ও রাজনীতির এক প্রদর্শক ও ভাষ্যকার। আবদুল হক বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, অতীত-মুখীনতা, বদ্ধমানসিকতা, মধ্যপ্রাচ্যমুখীনতা — এইসব লক্ষণ ঝেড়ে ফেলে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যকে বাংলাদেশীয় এবং আধুনিক সাহিত্য হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে 'সমকাল'-ই সবচেয়ে বেশি।' (আবদুল, ১৯৮৪ : ১০২)।

প্রগতিবাদী, নাগরিক রুচিবোধের সংঘবদ্ধ ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিরীক্ষাশীল, প্রথাবিরোধীদের তৃপ্ত করেনি *সমকাল*; *পরিক্রম*, *পূবালী*, *পূর্বমেঘ*ও ছিল প্রথাগত শিল্পব্যাকরণের অধীন। 'যূথবদ্ধ একটি সাহিত্য আন্দোলনের জন্ম দিতে' না-পারাটাই পত্রিকাগুলোর সবচেয়ে বড় অসাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তরুণরা। তাই সাহিত্য-আন্দোলনের যূথবদ্ধ মুখাবয়ব নিয়ে হাজির হয় স্বাক্ষর; ষাটের দশকের কবিতা-আন্দোলনে *স্বাক্ষর* একটি বড় মোড় ফেরা। অন্যদিকে *কণ্ঠস্বরের* ইস্তেহারমূলক ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী ঘোষণাটি এমন :

> যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর; যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত; যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট কণ্ঠস্বর তাদেরই পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহূত। (মান্নান, ১৯৮৯ : ৪৬)

কণ্ঠস্বরের ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতাবাদের ইঙ্গিত; নানারকম শৈল্পিক ভাঙচুর, অবক্ষয়ী ভাবনা, প্রথা নস্যাৎকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আধুনিকতার নতুন প্রান্ত সৃষ্টির

অভিলাষ — পূর্ব বাংলায়, বাংলাদেশে, যা অপরীক্ষিত। কিন্তু নিরীক্ষা আর নবীনতার ধ্বজাধারীদের ঔৎসুক্য কি পূর্ববঙ্গীয় সমাজ-ইতিহাসের স্বাভাবিক বিকাশের ফল? নাকি পরদেশী কবিতার প্রতি ঐতিহাসিক অধমর্ণতা? জাতীয়তাবাদী লড়াইয়ের তুঙ্গমুহূর্তে এই সাহিত্য কতটা সময়োচিত? পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে প্রতীচ্যমুখীনতা নিরাকৃত হয় নি। *কবিতা* পত্রিকার অনিবার্য প্রতাপে, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং ছিলেন বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের দীক্ষাগুরু; বুদ্ধদেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত *আধুনিক বাংলা কবিতা* সংকলনটি ছিল কবিদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। *কবিতা* পত্রিকায় অনূদিত হচ্ছিল বোদলেয়ারের *ক্লেদজ কুসুম*। এ-সময় অনূদিত বোদলেয়ারের প্রভাব মুদ্রিত হয়ে যায় পূর্ব বাংলার কবিদের সৃজন-মননে। জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রমহিমা মেনে নিয়েই কেউ কেউ মত্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রবিরোধিতায়। প্রেরণার অপর উৎসস্থল হয়ে উঠেছিল এলিয়ট, তারপর ধীরে ধীরে চিত্তজয় করেছে এলুয়ার, আরাগঁ, লোরকা ও নেরুদার কাব্যসম্পদ। শামসুর রাহমানের স্মৃতিতাড়িত বিবেচনা :

> ...সেই গ্রন্থটি আমরা যারা পঞ্চাশের দশকের কবি বলে চিহ্নিত, তাদের অনেককেই সম্মোহিত করেছিল। এবং আমি মনে করি, পঞ্চাশের দশকের কবিতার যে চেহারা দাঁড়িয়েছে তার কিছু অংশ হয়তো বুদ্ধদেব বসুকৃত সেই অনুবাদগুচ্ছ প্রকাশিত না হলে নির্মিত হত না। এমন কি সেই প্রভাব পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে ষাটের দশকের কবিদেরও স্পর্শ করেছিল। (শামসুর, ২০০১ : ১৪)

সিকদার আমিনুল হকের বক্তব্য :

> ...এই মর্মর অনুবাদগুচ্ছ আধুনিক বাংলা কবিতার জাগরণের প্রথম ও অভূতপূর্ব ঘটনা। যে অনিবার্য পরিবর্তন কাম্য ছিল এতদিন, তাকেই মূর্ত করে তুলেছে এই অনুবাদ — আমার কাছে এবং আমার মতো আরো অনেকের কাছে এই অনুবাদগুচ্ছ তাই এক বিরল ঘটনা। (সিকদার, ১৯৯৫ : ১৩)

আমেরিকার বীট-বংশীয় কবিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব যে প্রেরণা জুগিয়েছে তা আর অস্বীকার্য নয়। শামসুর রাহমান গীন্সবার্গের *হাউল* পড়ার মুগ্ধতা স্বীকার করেছেন। নির্মলেন্দু গুণ *গীন্সবার্গের সঙ্গে* বইতে জানিয়েছেন :

> গীন্সবার্গের মতো সাম্প্রতিককালের আর কোনো পাশ্চাত্য কবিই বাংলা কবিতাকে এতোটা প্রভাবিত করতে পারেনি। কলকাতার হাংরি জেনারেশন কিংবা ঢাকার স্বাক্ষর, কণ্ঠস্বর গোষ্ঠীর গঠনের পেছনে ছিল আমেরিকার বীট কবিদের গুরু গীন্সবার্গের ভারত ভ্রমণের প্রভাব। (নির্মলেন্দু, ২০০১ : ৫৬)

প্রতীচ্যের প্রণোদনা বিতর্ক-বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছিল; 'নাগরিকতা' বনাম 'গ্রামীণতা'র দ্বন্দ্ব থেকে কবিদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল রূঢ় বিরোধ। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৯৪৯) যেমন বলেন, 'এই বিভ্রান্তিতে আরো ইন্ধন যুগিয়েছিলেন ষাট-বাষট্টির দিকে যাঁরা তথাকথিত নগরকেন্দ্রিক ফ্রাসটেশনের কবিতা লিখেছিলেন, তাঁরা। পাশ্চাত্যের বীট ও এ্যাংরী জেনারেশন, পশ্চিমবঙ্গের হাংরী জেনারেশন এবং ইউরোপে বহুপূর্বে পরিত্যক্ত পরাবাস্তববাদী আন্দোলন তাঁদের অনেকের প্রেরণাস্থল।' (নূরুল, ১৯৮১ : ৯২)।

ষাটের দশকে আধুনিকতার দুটি সুস্পষ্ট ধারা গড়ে ওঠে এবং প্রাধান্য বিস্তার করে; এর একদিকে ইউরো-আমেরিকান লীলালাস্য ও ভাষিক কারুকাজ-শাসিত আধুনিকতা, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আবেগ-শাসিত উদার প্রগতিশীল আধুনিকতা; প্রথম ধারা ইতিহাসহীন, গন্তব্যরহিত। দ্বিতীয় ধারা জাতির লড়াই ও ইতিহাসের অংশীদার। নেতিশাসিত রোমান্টিকের ক্ষরণ ও ক্ষিপ্ততা এবং সমাজ-রাজনীতি-তাড়িত আকাঙ্ক্ষার নাতিদীর্ঘ মিলনও রচিত হয়েছে; কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই সাময়িক আবেগের বশবর্তী। পঞ্চাশের দশকের কবি শামসুর রাহমান এই সংহতি ও বিভেদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পার্শ্ব-উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণের নাম। কবিতার এই ঐতিহাসিক বাস্তবতায় আধুনিকতার ইতিহাসলগ্ন ও দেশজ রূপের খোঁজে মগ্ন থেকেছেন আল মাহমুদ (১৯৩৬), মোহাম্মদ রফিক (১৯৪৩), মুহম্মদ নূরুল হুদা। আল মাহমুদ আধুনিকতাকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে :

> আমি আধুনিকতা বলতে একটি জাতির বিশ্ববীক্ষা ও মানসিক অবস্থাকে বুঝি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সহবর্তী হয়ে আমাদের বেঁচে থাকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লড়াইটাও আধুনিক মানস গঠনে আমাদের জনগণকে সহায়তা করে। তবে সাহিত্যে আধুনিকতা হল ব্যক্তির অস্তিত্বের স্বাধীনতাকে উপলব্ধি ও কার্যকর করা। মানসিক সম্বন্ধসূত্রগুলো আবিষ্কার করতে গিয়ে মানুষে মানুষে যে সংঘাতের জন্ম হয় তার ব্যাখ্যা দেয়াও হল এক ধরনের আধুনিকতা। (মাহমুদ, ২০০৩ : ১৫)

এই বিবেচনা অবশ্য ষাটের দশকের নয়, আশির দশকের; আল মাহমুদের আধুনিকতা সম্পর্কিত ধারণা মানুষের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক অস্তিত্ব ও অগ্রবর্তিতার সঙ্গে সম্পর্কিত। শামসুর রাহমানও অগ্রসর চিন্তার প্রসঙ্গ এনেছেন; তিনি বলেন :

> আধুনিকতা সমকালীনতায় নয়, কবির মেজাজে প্রতিফলিত হয়। প্রথার বিরোধিতা ক'রে, অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখে লেখার চেষ্টা করেছি। আধুনিক হতেই হবে, এরকম একটি শপথ নিয়ে কোমর বেঁধে কবিতা লিখতে বসি নি। তবে বদ্ধ ডেরায় যে কাব্যের মুক্তি নেই, এই উপলব্ধি কবি-জীবনের গোড়াতেই হয়েছিল। মনের ভেতর ছিল নতুন সৃষ্টির জন্যে ব্যাকুলতা। সমাজ ও জীবন সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ ধারণার বিরোধী চেতনা, পাঠ এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে গেছে আধুনিকতার দিকে। (শামসুর, ১৯৯২ : ১৪৬)

কিন্তু অনাধুনিকতার বোধ, রুচিবদল, 'প্রথার বিরোধিতা', 'অগ্রসর চিন্তা', 'সমাজ ও জীবন সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ ধারণার বিরোধী চেতনা' ইত্যাদি অনুষঙ্গ কোন মানদণ্ডে কোন লক্ষ্যে এবং কী কী প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠল? গণমানুষের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক কী? পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিদের লেখালেখি, পাঠপ্রবণতা ইত্যাদির সাপেক্ষে দেখেছি রুচির বদলে, আধুনিকতার অর্থপ্রতিষ্ঠায় প্রতীচ্যের প্রভাববলয় তীব্রভাবে কাজ করেছে। '...যে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্যে আধুনিকতার উদ্ভব ঘটিয়েছে আমাদের মধ্যে অনুরূপ বাস্তবতার অনুপস্থিতি' লক্ষ্য করে আলাউদ্দিন আজাদ তাই বলেন, 'বাংলা কাব্যে আধুনিকতা অনেকটাই আহরিত পদ্ধতি।' (আলাউদ্দিন, ১৯৮২ : ৩১-৩২)। সত্তরের দশকে দেখা গেল আধুনিকতার আহৃত নেতিবাদী কলাপ্রকরণের প্রতিই অবিশ্বাস;

যে-পরাবাস্তবতাবাদ ছিল চরম আরাধ্য এ-দশকে সেই পরাবাস্তবতাবাদের প্রতিই দেখা গেল প্রবল অনাস্থা। অসীম সাহা লিখেছেন :

> আমাদের বিশ্বাস বস্তুর অস্তিত্বে। পরাবাস্তববাদীদের বিশ্বাস বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহানতায়। আপনি, আমি আপাতদৃষ্টিতে যা দেখছি স্পর্শ করছি তা প্রকৃতই স্পর্শ করছি কিনা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরাবাস্তবতা সমস্ত কিছুরই এমত বিশ্লেষণ করে থাকে। ফলে এ ক্ষেত্রে নৈরাশ্য শিল্পসৃষ্টিতে বাধা দান করে। (অসীম, ১৯৭৬ : ৫০-৫১)

এ-কারণে সত্তরের দশকে প্রকরণসর্বস্বতা বর্জিত হয়েছে। এ-দশকের কবিদের লক্ষ্য তাই সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা। ষাটের দশকে সাহিত্যপত্রে তরুণরা যেসব ইস্তেহার রচনা করেছেন সেগুলোতে সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিচৈতন্যের দায়বদ্ধতার সম্পর্ক উচ্চারিত হয় নি। সত্তরের দশকে দায়বদ্ধতাকে এড়িয়ে কবিতা লেখার প্রবণতা কমেছে; ষাটের দশকের কবি মোহাম্মদ রফিক এ-সময় ভেবেছেন ধ্রুপদীচর্চার কথা; কেননা আঙ্গিকের সাধনা করতে করতে ব্যক্তি বিচূর্ণিত ও খণ্ডিত। কিন্তু ধ্রুপদী সাহিত্যের কাছ থেকে জীবনের পাঠ নিয়ে নতুন করে মানুষের প্রকৃত ও প্রাকৃত অনুভূতিগুলো ধারণ করা সম্ভব। তিনি বলেন :

> আর এই বিচূর্ণিত ও বিপন্ন চেতনাকে একত্রিত করবার জন্যে আমাদের মৌলানুভূতির রাজ্যকে হৃদয়ের কারাগার থেকে মুক্ত করে দিতে হ'বে, যে কারাগারে কবিতার আঙ্গিক বা টেকনিকের নামে ধোঁয়াটে ও অসার মন্তব্য করে এদেরকে বন্দী রাখা হয়েছে। একমাত্র এই অনুভূতির মাধ্যমেই মিলে যাবে সমস্ত জীবন যার ছায়া পড়বে সাহিত্যে, শিল্পে, বেঁচে উঠবে কবিতা, মানুষের ধমনীর রক্ত হবে চঞ্চল। (রফিক, ১৯৭২ : ৯১)

স্বাধীন বাংলাদেশে সংঘটিত অরাজকতা ও সামরিকায়নে কবিরা যেন জীবনের তল হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই এ-দশকে কবিতা শিল্প ও স্লোগানের সমন্বয়ে হয়ে উঠল প্রতিরোধের ভাষা। দাউদ হায়দার (১৯৫২), রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১), মোহন রায়হানের (১৯৫৬) কবিতায় এই রূপটি প্রকাশিত। আবিদ আজাদ (১৯৫২-২০০৫) কবিতায় নতুন করে বহতা রাখেন মধ্যবিত্তের স্মৃতিকাতর রোমান্টিকতা, প্রেম, রিরংসা ও যৌনতা। সত্তর দশকের কবি নাসির আহমেদের পর্যবেক্ষণ :

> ...আমাদের মতে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নতুন কবিগোষ্ঠীর কবিতায় এসেছিলো স্বদেশ আর সমাজ সচেতনতার তীব্র জোয়ার। সেই সঙ্গে ষাটের কাব্যধারা থেকে বেরিয়ে আসার একটি সচেতন প্রয়াস। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই প্রয়াস যতটা তার চেয়ে বেশি বিষয়ের ক্ষেত্রে। এই সময়ের কবিরা শুধু নান্দনিকতা আর ব্যক্তিগত আর্তনাদের চেয়ে অধিকতর স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক অবক্ষয় আর ব্যাপক সর্বগ্রাসী পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছেন যেমন, তেমনি অনেকে প্রতিবাদীও হয়েছেন। (নাসির, ১৯৮৪ : ৭)

অর্থাৎ কবিতার নান্দনিকতার দিকটি জরুরি হয়ে ওঠে নি বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতা ও স্লোগান অভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খান বলেছেন, 'বাঙালির জাতীয় জীবনচৈতন্যের সামগ্রিক উত্তরণের লক্ষ্যে এ সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেই সব প্রতিবাদী, আত্মবিশ্বাসী ও শিল্প-অভিজ্ঞানমণ্ডিত কবিকণ্ঠ, যাঁরা হৃদয়াবেগ ও জীবনাবেগের সমন্বিত পরিচর্যায় কবিতাকে পরিণত করতে সক্ষম বিক্ষোভের শিল্পিত

শব্দরূপে, যাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন এমন একটি অনিবার্য চিত্রকল্প, যা জনজীবনের সমগ্রতার অঙ্গীকারে হয়ে উঠতে পারে তরঙ্গিত, স্পন্দিত ও অব্যর্থ।' (রফিকউল্লাহ, ২০০২ : ৫৫) ফলে কবিতা সমকালীন সমাজ-রাজনৈতিক প্রতিবেদন-রচনা এবং সাময়িক আবেদন সৃষ্টিক্ষম হলেও ভবিষ্যাভিসারী হয় নি। এ-কারণে সত্তর দশক ধরে চর্চিত বিবরণের বিপুলতায় আশির দশকে কবিরা আবারও শিল্পে নান্দনিকতার তাগিদ অনুভব করলেন। 'বিন্দুবাদী কবিতা', 'সমগ্র কবিতা', 'বিকল্প কবিতা', 'নতুন কবিতা' ইত্যাদি নামায়নের ভেতর দিয়ে সূচিত হল নিরীক্ষার নতুন কোলাহল। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণসূত্রে দীর্ঘদিনের আধুনিকতা-প্রসঙ্গেই কবিরা তুললেন ভিন্নতর জিজ্ঞাসা। *একবিংশ*, *গাণ্ডীব* ও *অনিন্দ্যের* মতো ছোটকাগজের পাতায় পাতায় ঘোষিত হলো আধুনিকতার মৃত্যু-পরোয়ানা। এ-দশকের কবিতা সম্পর্কে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের (১৯৫০-২০১৩) মূল্যায়ন :

> আশির কবিতা এক অর্থে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যিক মন্ময়তা, দার্শনিক অনুভবন এবং প্রাজ্ঞ উচ্চারণের দিকে পাশ ফিরেছে। কিন্তু সেই সাথে সমসাময়িক রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনা, মানুষের বিবিধ প্রাত্যহিক বাস্তবতা, তার স্বপ্ন-হতাশ, অভিকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়কেও মিলিয়ে নিতে চাইছে একটি সিন্থেসিসের ভেতর। (আশরাফ, ১৯৯০ : ৮৬)

নব্বইয়ের দশক জুড়ে এ-প্রবণতার বহুমাত্রিক বিস্তার ঘটেছে। উত্তর-আধুনিকতা, উত্তর-ঔপনিবেশিকতার তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ধারণা আশি ও নব্বই দশকে কবিতার নতুন প্রবাহ তৈরি করেছে। কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিকল্পিত প্রয়োগের হার অন্যসব দশকের তুলনায় নিশ্চিতভাবে বেড়েছে। ছোটকাগজসূত্রে পশ্চিমবাংলার তত্ত্বাশ্রয়ী কবি এবং তাত্ত্বিকদের অভিঘাত আবারও জোরদার হয়েছে বাংলাদেশে। তাই বাংলাদেশের তরুণ কবিতায় তপোধীর ভট্টাচার্য খুঁজতে থাকেন 'উত্তর-আধুনিকতার নন্দন-প্রস্থান' কিংবা 'উত্তর-আধুনিক জীবনভাবনার সারাৎসার'। তাঁর প্রস্তাব :

> সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ ও এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে উত্তর-আধুনিক জীবনদর্শনই হতে পারে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ। এই উপলব্ধি ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী কবিদের মধ্যে — যেমন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, আসামে, ত্রিপুরায় তেমনি বাংলাদেশে। যাত্রী সবাই একই তরণীর। বাংলা কবিতায় এই হলো আজকের পরিপ্রেক্ষিত স্পষ্টতই যাতে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সংবেদনার দ্বান্দ্বিকতা এবং বহমান সময় ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের আবর্তন বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নানাধরনের মূল্যমান তৈরি করে চলেছে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আধুনিকতাবাদ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সংশয় ও অনিবার্য কিছু প্রশ্নের উপস্থাপন। (তপোধীর, ১৯৯২ : ২৮)

নব্বইয়ের ইতিহাস আরও জটিল ও বিভঙ্গময়; আধুনিকতার পাশাপাশি উত্তর-আধুনিকতা নিয়ে বহুমাত্রিক বিতর্ক গড়ে উঠেছে এ-সময়। প্রকাশিত হয়েছে উত্তর-আধুনিক কবিতার সংকলন এবং ছোটকাগজ। তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, কবিতা-নির্বাচনের দিক থেকে একটি সংকলনের সঙ্গে অন্যটির ব্যবধান মেরুদূরপ্রতিম। এ-দশকের কবিতা সম্পর্কে বেগম আকতার কামাল বলেন :

> বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক অর্ধবুর্জোয়া বা প্রাক্‌বুর্জোয়া মানসে যে আধুনিকতার তরঙ্গায়ন ঘটেছিল,তা প্রবাহিত হয়েছিল জাতীয়চেতনার জাগরণ খাতে। লোকাভিমুখী ইতিহাসদৃষ্টির রন্ধ্রপথে তার বর্ণিল প্রকাশ পূর্ববর্তী কাব্যকায়াকে করেছিল অনুরাগসিঞ্চিত, ব্যষ্টি-সমষ্টির দ্যোতনায় অভিষিক্ত। কিন্তু এই প্রকাশই ইতিহাসের নিয়মে দ্বিমুখী বৈপরীত্যে প্রধাবিত হয় : এক, জাতীয় চেতনার বিলম্বিত ও বিসর্পিল পথযাত্রায়, দুই. সংস্কৃতি-সংকটের কূটত্বে। এটাই নব্বইয়ের কাব্যকাঠামো। এর আবার ত্রয়ী লক্ষণ, ক. বিশ্ব ও বস্তুচেতনার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল দৃষ্টির অভিঘাত, খ. রাজনীতি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সঙ্গে গড়ে-ওঠা বিচ্ছিন্নতার অতিক্রমণ-লক্ষ্যে প্রতিবাস্তব জগতে প্রবিষ্ট হওয়া, গ. আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠিত ফর্মের সঙ্গে অসদ্ভাব গড়ে তোলার বৈনাশিকতা ও আত্মবিরুদ্ধ হয়ে পড়া। (আকতার, ২০০৩ : ৩১)

বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিকতার প্রয়োগ ও পদ্ধতি এক নয়। আধুনিকায়নের আয়োজনও একরৈখিক পথ ধরে এগিয়ে যায় নি। আধার ও আধেয়গত নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিক নানামাত্রিক অভিজ্ঞতা, জাতীয়চেতনা, ঐতিহ্যমুখীনতার সমাবেশ ঘটেছে বাংলাদেশের কবিতায়। আমরা এবার দেখার চেষ্টা করব, বাংলাদেশে অনুশীলিত আধুনিকতা বিষয়ক বিশ্লেষণের ধরন ।

৪. আধুনিকতার চর্চা (১৯৪৭-২০০০) : বাংলাদেশ-পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের কবিতার আধুনিকতা বা আধুনিকায়ন বিষয়ক চর্চায় অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হাসান হাফিজুর রহমানের *আধুনিক কবি ও কবিতা* (১৯৬৫); এ-গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'আধুনিক কবিতার লক্ষণ' (১৯৫৭)। এ লেখায় আধুনিকতা ও রোমান্টিকতাকে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের বলে উল্লেখ করেছেন। যেখানে 'বস্তুগত কিংবা নীতিগত কিংবা ভাবগত কোনো নির্ধারিত standard-কে সামনে রেখে' রোমান্টিকতার উজ্জীবন সেখানে 'জীবনের সাংসারিকতায়, লোকবুদ্ধির হিসেবি প্রত্যহে আধুনিকতার উৎস'। (হাসান, ১৯৯৪ : ৩২৯-৩৩০)। অর্থাৎ রোমান্টিকতায় যে-পরমের উপস্থিতি অনিবার্য, আধুনিকতায় সে-পরম বলে কিছু নেই, সেখানে 'মানবীয় বা বস্তুগত সম্পর্ক সর্বত্র আপেক্ষিক হয়ে উঠেছে'। (হাসান, ১৯৯৪ : ৩৩০)।

হাসান হাফিজুর রহমান বিভাগপূর্ব যুগের কবিতায় আধুনিকতার দুটি দিক লক্ষ করেছেন : ১. 'ভাষা এবং শব্দচয়ন', ২. 'সমসাময়িকতা' বা 'ঘটনাচেতনা'। ভাষা ও বিষয়ের ক্ষেত্রে আধুনিকতার লক্ষণ বাস্তব ও সমকালীন প্রতিবেশ-পরিপার্শ্ব-সংলগ্নতা। হাসানের ভাষ্যে বুদ্ধিবাদী আধুনিক মানুষের চেতনা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তিনটি ধারায়, 'প্রথমত, অন্তর্লীন ও আবহমান ইতিহাসবোধ, দ্বিতীয়ত, জাগতিক ঘটনা-পারম্পর্য ও প্রেক্ষিতবিশ্লেষণ প্রচেষ্টায় ধারণাসম্পাত ও অভিজ্ঞতা-প্রয়োগ এবং তৃতীয়ত অবচেতন-সজ্ঞানতা ও মনোবিকলন।' (হাসান, ১৯৯৪ : ৩৩১)। আর এই অনুপুঙ্খ জীবনসন্ধানের মাধ্যমেই প্রসারিত হয় আত্মবোধ; যা আত্মসত্তার চারপাশে আবর্তিত জটিল দৃশ্যপটের উদ্ঘাটনে আধুনিক কবিকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সত্তার অতিক্রমণের পথ প্রাক্‌নির্দিষ্ট নয়; 'সে-কারণে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসা, আপাতবিরোধিতা, হতাশা অথবা উল্লাস, আত্মঘাতী ক্রোধ কিংবা আত্মনির্মাণের প্রবল ও অপরূপ উত্তেজনা, ক্লান্তি অথবা বিভীষিকা প্রভৃতি চাঞ্চল্যকর জটিল

সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষোভে আধুনিক কবিতার সর্বাঙ্গ আমরা আলোড়িত হতে দেখি।' (হাসান, ১৯৯৪ : ৩৩২)। আধ্যাত্মিক, অলৌকিক প্রেরণাবাদী প্রাক-রোমান্টিক পর্ব এবং আত্মসচেতনতার রোমান্টিক পর্বের পর আধুনিক কালের কবিতায় হাসান হাফিজুর রহমান দ্বৈত সূত্রের প্রয়োগ দেখেছেন, 'জাগতিক বস্তু সম্পর্কে বিমূর্ত ধারণা বা Pure experience' এবং 'নিজের মনকে প্রকাশ করার দুরন্ত অভিলাষ।' (হাসান, ১৯৯৪ : ৩২৬)। জগৎ-যুগচেতনা এবং আত্মঘোষণার সম্পর্ক বিশ্লেষণে দেখি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কবিতায় অবক্ষয়, অবসাদ, হতাশাকেই যুগসত্য হিসেবে ধরা পড়তে দেখেছেন হাসান হাফিজুর রহমান।

লেখক আধুনিকতার সংকট উপলব্ধি করতে গিয়ে দেখেছেন আধুনিক ধনিক সভ্যতা ক্রমশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, যন্ত্রশাসিত ও একক হয়ে উঠেছে। অথচ রোমান্টিকতার ভেতর দিয়ে ব্যক্তিরই জাগরণ ঘটেছিল। ব্যক্তি চেয়েছিল সৃষ্টিশীলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল বিস্তার। অথচ মানবীয় আবিষ্কার যন্ত্রই হয়ে উঠল শাসন-শোষণের মাধ্যম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যান্ত্রিক দাসের মালিকরা হলেন প্রভু। যন্ত্রমালিকের কাছে ব্যাপকতর জনগোষ্ঠী বা সমষ্টির কোনো তাৎপর্য নেই। সামাজিক আধুনিকতার এই মানবিকতাবিরোধী দিকটি বোঝাতে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন, 'যান্ত্রিক উন্নতির চূড়ান্ত উৎকর্ষ আমাদের অজান্তেই একান্তভাবে ঈপ্সিত ও অন্বিষ্ট মানবিকতার মূলেই কুঠারাঘাত হেনে বসেছে যেন।' (হাসান, ১৯৯৪ : ৩৪২)। পরদেশি প্রভাবে বাংলা কবিতাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিকে ঝুঁকেছে। পাশাপাশি গ্রহণ করেছে শিল্পসৌন্দর্যবাদের তত্ত্ব, যেখানে শিল্পের অগ্রাধিকার প্রবল। হাসান হাফিজুর রহমান প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিল্পকলার এই ধনতান্ত্রিক বিমানবিক বিকৃতিকে সমর্থন করেন নি। এ-ধরনের আধুনিকতাকে তিনি যুগলক্ষণ হিসেবে মানলেও যুগচেতনার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী নন। হাসান হাফিজুর রহমানের আধুনিকতা বিষয়ক ভাবনায় আমরা মূলত অবক্ষয়বাদী আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি।

'আধুনিক কবিতার সমস্যা' (১৯৫৮) শীর্ষক লেখায় আহমদ রফিকও অবক্ষয়বাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন, 'সংকেতহীন শব্দচয়ন, চিত্রকল্পের অনবধান ব্যবহার, অনুষঙ্গ ও পুনরুক্তির হঠাৎ চমক লাগানোর প্রচেষ্টা, বক্তব্যহীন নীরস শব্দোচ্ছ্বাস' আধুনিক কবিতাকে প্রাণহীন ও রুক্ষ করে তোলে। (আহমদ, ২০০৭ : ৩৭)। আধুনিক কবির কাছে তাঁর প্রত্যাশা, 'রোমান্টিক ভাববিলাসিতার কল্পলোক, একঘেয়ে আঙ্গিকচর্চার উন্নাসিকতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে আধুনিক আত্ম-সচেতন প্রগতিশীল কবিকে।' (আহমদ, ২০০৭ : ৩৯)

পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের অন্যতম তাত্ত্বিক কবি গোলাম মোস্তফা আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য ও ব্যর্থতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর 'আধুনিক কবিতা' (১৯৬২) প্রবন্ধে। এ-প্রবন্ধে প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করলে পাই, এক. আধুনিকতা ইউরোপের সৃষ্টি; দুই. আধুনিক কবিতার জনক বোদলেয়ার; তাঁর কাব্যতত্ত্বে কবিতার সবটুকুই কাব্যময় হিসেবে বিবেচিত এবং 'বাস্তব জীবনের গভীর সত্যানুভূতি ও বিচিত্র রহস্য-উদ্ঘাটনই' এ-

ধারার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য; তিন. আঙ্গিক-পরিবর্তনের লক্ষ্যে আধুনিক কবিতা শব্দপ্রয়োগে মিতব্যয়ী, নতুন উপমা-অনুপ্রাস-রূপক প্রয়োগে চিত্রকল্প সৃষ্টিতে উৎসাহী; চার. আধুনিক কবিতা মনস্তত্ত্ব-প্রধান; সমকালীন কাব্যপরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে তিনি দেখেন আধুনিক কবিতা সংকটাপন্ন; কেননা আধুনিক কবিতা রোমান্টিকতা-বিরোধী, কবিতার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে গিয়ে কৃত্রিম, চিন্তার উল্লম্ফনতা দোষে আক্রান্ত ও ছন্দবর্জিত। ১৯৬২-তে তিনি দেখছেন পূর্ব-বাংলার কবিতা আধুনিক হয়ে ওঠে নি এবং তা মূলত পশ্চিম বাংলার কবিতার যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন। আর অনুকৃতির পৌরোহিত্যে আধুনিকতা দিশা পায় না। এজরা পাউন্ডের বক্তব্য আশ্রয় করে বলেন, 'কোনো নূতন আবিষ্কার না-করা পর্যন্ত কোনো কবিরই আধুনিক বলে দাবী করার কোনো অধিকার থাকবে না। প্রচলিত বস্তুর অনুকরণের মধ্যে আধুনিকতা নেই, নূতন আবিষ্কারের মধ্যে আছে।' (গোলাম, ১৯৬৮ : ২৯৩)

আধুনিকতা-বিষয়ক বিতর্ক এবং প্রচলিত আধুনিকতার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন আবদুল হক। 'আধুনিক কবিতা' (১৯৬৭) শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখক দেখিয়েছেন বাংলা কবিতায় আধুনিকতার ধারণা বিতর্কবিচ্যুত নয়; জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমলেন্দু বসু বা অশোক মিত্রের আধুনিকতাবোধ নিশ্চিতভাবেই স্বতন্ত্র স্বভাবের। আবদুল হক অবশ্য আধুনিকতার নতুন কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তিনি মুখ্যত 'বোধগম্য না হওয়া, ছন্দ অনাবশ্যক, সুপঠনীয়তা অনাবশ্যক, সুঠাম গঠন অনাবশ্যক' এবং 'গদ্যময়, কর্কশ, লাবণ্যহীন, বিশ্রস্ততনু' কবিতাকে আধুনিক কবিতার প্রচলিত চারিত্র্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (আবদুল, ২০০২ : ১৬৮-১৬৯)। কবিতাকে দুরূহ করার একটি সচেতন প্রয়াস লক্ষ করেছেন আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে। বিশেষত ফরাসি ও ইংরেজ কবিকুলের চর্চিত পরাবাস্তবতাবাদী কাব্যরীতি যে বাংলা কবিতায় ফলপ্রসূ হয় নি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মত দিয়েছেন আবদুল হক। দুর্বোধ্য, 'চিন্তায় ও প্রকরণে সুদূরাশ্রয়িতা', 'চতুর রহস্যময়তা' এবং কৃত্রিম আঙ্গিক সর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত তাই এমন, 'আধুনিক বলে আশ্বাস দেওয়া হয় এমন বহু কবিতার প্রায়শ কোনো বক্তব্য নেই। এই বক্তব্য ব্যতীত কবিতা একটা কাঠামো মাত্র। আধুনিক কবিতা অনেক সময় এই কাঠামো-চর্চা, আঙ্গিকচর্চা, তাও বিকলাঙ্গের। আধুনিক কবি আত্মপ্রকাশের উত্তাপে নব নব প্রকরণ উদ্ভাবন করেন না, পশ্চিমী সাহিত্য-অধ্যয়নলব্ধ প্রকরণ-জ্ঞান ও ভাববস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করেন।' (আবদুল, ২০০২ : ১৭২)। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতার সাপেক্ষে করা এই উক্তি আধুনিকতার নেতিবাচক স্বভাবগুলো চিনিয়ে দিতে সক্ষম।

সৈয়দ আলী আহসানের আধুনিকতা বিষয়ক চর্চা স্থিত প্রধানত আধুনিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে। 'সীমাবদ্ধ শব্দসম্ভার', ব্যঞ্জনাহীন শব্দব্যবহার, নির্দিষ্ট আঙ্গিক-নির্ভরতা, পুনরাবৃত্তিপ্রবণ সমধর্মী যুদ্ধ-প্রকৃতি-নারী বর্ণনা ইত্যাদির ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন-মধ্যযুগের সাহিত্যকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। তাঁর মতে, আধুনিক কালের সাহিত্যের বিশিষ্টতা 'শব্দের সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করা', 'তার ঐতিহ্য সন্ধান করা' এবং 'তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করা'। (আহসান, ১৩৭৫ : ৩১০)। আধুনিক

শিল্পীর কাজ 'ব্যক্তিমানসের রূপ উদ্‌ঘাটন'। (আহসান, ১৩৭৫ : ৩১০)। অর্থাৎ আত্মসত্তাবোধের উন্মোচন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম লক্ষণ। অন্যদিকে মধ্যযুগের কবিদের চেষ্টা 'একজনের কথা বলে যেনো সকলের কথা বলা যায়।' (আহসান, ১৩৭৫ : ৩১০)। আধুনিক কবিতায় ব্যক্তিসত্তার অনুভূতি ও আবেগের ওপর কবিতার আঙ্গিক নির্ভরশীল; কিন্তু মধ্যযুগীয় কাব্যে 'আঙ্গিকের নির্দেশে'ই তৈরি হত কবির অনুভূতি বা আবেগের মাত্রাভেদ।

আধুনিকতার সঙ্গে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক কেমন হবে এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজেছেন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর ভাষায় 'মধ্যযুগে চিত্তবিকাশের প্রধান অবলম্বন ছিলো ধর্ম' আর এর বিস্তার 'সমষ্টির সত্তায়'। (আহসান, ১৩৭৫ : ৩১৩)। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে 'বিজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল' এবং ধর্মের প্রকাশ 'প্রগাঢ়-উপলব্ধির প্রসূনরূপে'। (আহসান, ১৩৭৫ : ৩১৪)। আধুনিক সাহিত্যকে প্রধান তিনটি চেতনার ফল হিসেবে দেখেছেন তিনি; সেগুলো হল: ক. যুক্তিবুদ্ধি, খ. বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও গ. আপন সময়বন্ধন অতিক্রমণ। সৈয়দ আলী আহসানের আধুনিকতাবোধ প্রধানত সাহিত্যে শব্দের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ প্রয়োগ, ব্যক্তিসত্তার জাগরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-গ্রন্থের বিচিত্র ও বৈশ্বিক প্রবহমানতার সঙ্গে লেখক-শিল্পীর সংযোগ ইত্যাদি শর্ত দ্বারা নির্ধারিত।

নিরাশ্রয় গৃহী (রচনাকাল ১৯৬৮-৭৪) গ্রন্থভুক্ত 'গ্রাম্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা' প্রবন্ধে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'আধুনিকতা', 'গ্রাম্যতা' ও 'প্রগতিশীলতা'র তুলনা করেছেন; তাঁর চোখে গ্রাম্যতার স্বভাব 'স্বল্পে সন্তুষ্টি', 'অকারণ উত্তেজনা', 'সহজ উৎফুল্লতা'; গ্রাম্য মনের ধরন 'বহির্জগতবিচ্ছিন্ন', 'সন্দেহাচ্ছন্ন', 'সংশয়বিহীন'। তিনি লিখেছেন, 'আধুনিক মন আলোকিত মন। অন্ধকারকে সে বিনষ্ট করতে চায়, উন্মোচিত করতে চায় ব্যক্তির শক্তি ও সম্ভাবনাকে। তার পথটা সৃজনশীলতার।' (সিরাজুল, ২০০২ : ৫০)। তবে বাংলাদেশে আধুনিকতা যে প্রধানত একটি বিশেষ শ্রেণির উন্নতি ও অগ্রসরমানতা নির্দেশ করে সে-সম্পর্কে বিশ্লেষণ উঠে এসেছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখায়। তাঁর ভাষ্যে লক্ষ করি, পশ্চিমী আধুনিকতার তরঙ্গ-অভিঘাত বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের জীবনে সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। 'হিন্দু বাবু' ও 'মুসলমান মিয়া'দের মধ্যে তাই স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছে। আবার বিশেষ শ্রেণির এই দুই আধুনিকতা 'মোটেই যুক্ত নয় উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে'। (সিরাজুল, ২০০২ : ৫০)। এই আধুনিকতার জন্যে আমাদের প্রতীক্ষা ছিল বহু দিনের। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে আমাদের মনে জেগে উঠেছে 'পুরাতন অন্ধকারের হাত থেকে নিস্কৃতি' পাবার বাসনা। (সিরাজুল, ২০০২ : ৪৯)। কিন্তু বাংলা অঞ্চলে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। এগুলোর সমান্তরালে মিশেছে বিলেতি আধুনিকতার বাহ্যিক ভঙ্গিসর্বস্ব অনুকরণ। মাইকেল-দীনবন্ধুর প্রহসনে নির্মিত চরিত্রে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আধুনিকতার ব্যর্থ অনুকৃতি দেখতে পেয়েছেন। কালীবাবু-নববাবু-নিমচাঁদরা প্রচলিত প্রথা, রীতি ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যে-ধরনের প্রতিবাদ প্রকাশ করেছে সে-সব প্রতিরোধ সৌখিন উত্তেজনা ও আস্ফালনে ভরা। অথচ 'মৌলিক ও যথার্থ

আধুনিকতায় একটা প্রতিবাদ আছে। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, প্রবীণের রীতি ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে।' (সিরাজুল, ২০০২ : ১২৫)।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, 'আধুনিকতা নিশ্চয়ই চাইবো। তেমন আধুনিকতা যা মন থেকে হৃদয়ের দিকে, হৃদয় থেকে স্বভাবের দিকে নিরন্তর চলবে। যে-আধুনিকতা সৃজনশীল, যা আলোকিত করবে সমাজের সমস্তটা অংশকে, পরিবর্তন আনবে অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থায়। প্রকৃতিকে জয় করতে, রোগের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আধুনিকতাকে আমাদের এখনই প্রয়োজন।' নেতিবাদ আর প্রতিক্রিয়াশীল আধুনিকতার পরিবর্তে তিনি চেয়েছেন প্রগতিশীলতা। কেননা 'প্রগতিশীলতার প্রকৃত ভিত্তি ও যথার্থ লক্ষণ হবে সামাজিক পরিবর্তন।' মূলত আলোকপর্বের ধারাবাহিকতায় প্রগতিশীল সামাজিক বিকাশ ও দায়বদ্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর আধুনিকতা বিষয়ক বক্তব্য।

আনন্দের মৃত্যু নেই (১৯৮৪) বইতে মহাদেব সাহা আধুনিকতাকে দেখেছেন মানুষের অতৃপ্তিবোধ ও কৌতুহলী-প্রবণতার আলোকে। তাঁর মতে, 'এই প্রশ্ন, এই জিজ্ঞাসা ও এই সংশয়ই আধুনিকতার লক্ষণ।' (মহাদেব, ১৯৮৪ : ১)। আধুনিকতায় প্রধানত দুটি ধারাকে অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন তিনি, একদিকে সমাজতন্ত্র, অন্যদিকে, রোমান্টিকতা। আর এ-কারণেই মহাদেব সাহা 'মানবিকতার আদর্শে উজ্জীবিত' আধুনিকতার সমর্থক। (মহাদেব, ১৯৮৪ : ১৯)।

১৯৮৭-তে 'বাংলা সাহিত্য ও অন্য দিগন্ত' শিরোনামের লেখায় আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ ও যুগপরম্পরা নির্দিষ্টকরণসহ বিভিন্ন বিতর্ক হাজির করেছেন হায়াৎ মামুদ। তাঁর মতে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা নিয়ে প্রামাণিক কালপঞ্জি বা অনুপুঙ্খ জরিপই সম্পন্ন হয় নি। ফলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি আধুনিকতার উন্মেষপর্ব ও ভাবার্থ। আপাতভাবে মনে করা যেতে পারে ১৯১৪-তে *সবুজ পত্র* পত্রিকার প্রকাশ এবং ১৯৩৫-এ *কবিতা* পত্রিকার প্রকাশ – দুইয়ের মধ্যবর্তী কালপর্বই আধুনিকতার জাগরণকাল। ভাবের দিক থেকে আধুনিকতাকে ভাবা যেতে পারে এমন — রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত বাংলা সাহিত্যের আধার ও আধেয় ডিঙিয়ে ভিন্ন খাত তৈরি করা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের সাহিত্যের সীমানা ভেঙেছেন। কিন্তু এতেও তরুণতম কবি-শিল্পীর সঙ্গে রাবীন্দ্রিক চিন্তাপরিমণ্ডলের বিবাদভঞ্জন ঘটে নি। হায়াৎ মামুদ রবীন্দ্র-সমকালীন তরুণ 'আধুনিক' বা 'অতি-আধুনিক'দের লেখায় প্রধান চারটি শ্রেণির বিষয়বস্তু দেখতে পেয়েছেন, '১. যৌনমনস্তত্ত্ব-অবদমিত কাম-মনোবৈকল্য; ২. পারিবারিক ও সমাজবন্ধনের অন্তরালে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি; ৩. সমষ্টিচৈতন্য, অর্থাৎ একক ব্যক্তি থেকে সামাজিক 'শ্রেণী'র দিকে চোখ ফেরানো— অন্য কথায়, রাজনৈতিক অর্থে 'সমাজচেতনা'; ৪. আবেগশাসিত অনুভূতিসর্বস্বতার বিপরীতে মস্তিষ্ক প্রধান, বুদ্ধিপ্রবণ, যুক্তিনিয়ন্ত্রিত মনোজগৎ।' (হায়াৎ, ১৯৮৯ : ৬৪)। তাঁর বিবেচনায় এগুলো পশ্চিমা জগতের ভাব-বুদ্ধি ও শিল্পসাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সূত্র ধরে বাংলায় প্রবেশ করেছে 'ইংরেজি বই এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে অনূদিত ইউরোপ'। (হায়াৎ, ১৯৮৯ : ৬৫)। পশ্চিমমগ্নতা

সত্ত্বেও আধুনিকতার মূল্যবোধগত যে-ধারণা তৈরি হয়েছে হায়াৎ মামুদের মতে, 'এই ধারণাটি প্রধানত শৈলীনির্ভর, গৌণত বিষয়নির্ভর।' (হায়াৎ, ১৯৮৯ : ৬৮)।

হায়াৎ মামুদ মনে করেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাহিত্যধারা আধুনিকতার যে-পটভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা মূলত পূর্বতন অখণ্ড বাংলার ইউরোপতাড়িত আধুনিক সাহিত্য-ঐতিহ্য। তাই তিনি দেখেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী কিংবা সৈয়দ শামসুল হকের লেখায় বিচ্ছিন্নতাবোধের বিস্তার। আর এই বিচ্ছিন্নতাবোধের সম্ভাব্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কেননা আধুনিক মানুষের মনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির পেছনে যে-সব আর্থ-সামাজিক কার্যকারণ বিদ্যমান সেসব কারণ ঢাকায় তখনও তৈরি হয় নি। আধুনিকতার জন্ম নাগরিক জনপ্রবাহে — এই সত্য সামনে রেখেই হায়াৎ মামুদ বলেছেন, 'ভয়ে-ভয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যে-সব 'আধুনিক' বোধ জন্মাবার ক্ষেত্র এদেশের ঢাকা রাজধানীতে বা গ্রামীণ লোকালয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, সেই বোধ ও ধারণাসমূহ আমরা কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে নিয়ে এসেছিলুম।' (হায়াৎ, ১৯৮৯ : ৬৮)। একটু দ্বিধাকম্প্র অনুমানের স্বরেই বলেছেন যে, সাহিত্য-বাজারে অস্তিত্ববাদী দর্শন বা সার্তে-কামুর রচনাবলি পৌঁছে গেছে, আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ হয়তো সেখানে নিহিত। দশকের পর দশক জুড়ে চলেছে এই পশ্চিম ও কলকাতার আধুনিকতার জয়ধ্বনি। সুররিয়ালিজম বা মার্কিন বীট জেনারেশনের শিল্পতরঙ্গ প্লাবন তুলেছিল বাংলাদেশের কবিতায়। কিন্তু ১৯৭১ বাংলাদেশের সকল পশ্চিমী অভিজ্ঞতাকে ত্রস্ত করে দিয়ে নতুন সমাজসত্যের সামনে দাঁড় করিয়েছে। হায়াৎ মামুদ এই পর্বকেই মনে করেন পুরনো পৃথিবীর শেষ এবং বাংলাদেশের মানুষ, জীবন, জনপদ ও সাহিত্যশিল্পের জন্য এক নতুন আরম্ভ। শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিকের লেখায় কিংবা কামরুল হাসান, সুলতানের আঁকায় দেখতে পেয়েছেন শৈলীগত আধুনিকতার নতুন মুখ, যা 'বিদেশের ধারাবাহিক অনুকরণ নয়।' (হায়াৎ, ১৯৮৯ : ৮০)। বিশ্বসাহিত্য থেকে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেই এই আধুনিকতা দেশ-মৃত্তিকায় নিহিত।

হায়াৎ সাইফ আধুনিকতার প্রসঙ্গটিকে দেখেছেন 'একটি জনগোষ্ঠীর সাধারণ রুচি ও শিক্ষার মানের' ওপর নির্ভরশীল করে। মূলত 'অগ্রসর', 'অনগ্রসর', 'প্রতিক্রিয়াশীল' প্রভৃতি শব্দের বিন্যাসে ইতিহাসের গতিপথ বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'অনগ্রসর সাধারণ ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণবাদের কাছে সংশ্লিষ্ট সময় থেকে অগ্রসর শিল্পকর্মকে সমস্ত যুগেই নতুন ও সে কারণে দুর্বোধ্য এবং এমনকি উদ্ভট মনে হয়েছে।' (সাইফ, ১৯৯২ : ৮৪)। আসলে তিনি আধুনিকতার প্রবহমানতার কথাই বলতে চেয়েছেন। হায়াৎ সাইফের দৃষ্টিতে নতুন বিষয় ও আঙ্গিক-সন্ধানী অভিযানের ভিত্তিভূমিতেই 'আবহমান' বাংলা ও বিশ্বকবিতার আধুনিকতা। অর্থাৎ, শেষতম সাম্প্রতিকই যেন আধুনিক।

বাংলাদেশে আধুনিকতাবাদের তীব্র সমর্থক হুমায়ুন আজাদ। ১৯৯৪-এ সম্পাদনা করেছেন আধুনিক বাংলা কবিতার এক বিতর্কিত সংকলন। তাঁর আধুনিকতাবোধ, কবি ও কবিতা নির্বাচন-গ্রহণ-বর্জন প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুমুল বিতর্ক উৎপাদন করেছে। তাঁর আধুনিকতা বিষয়ক ভাবনা সন্ধানের জন্য তেমনি একটি বিতর্কিত কিন্তু জরুরি প্রবন্ধ 'শিল্পকলার

বিমানবিকীকরণ' (১৯৮৬)। স্পেনীয় দার্শনিক-তাত্ত্বিক হোসে আর্তেগা ঈ গাসেতের 'শিল্পকলার বিমানবিকীরণ' প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা এ-প্রবন্ধে হুমায়ুন আজাদ আধুনিক শিল্পকলার স্বভাব বর্ণনা করেছেন। তাতে বুঝতে পারি, আধুনিক শিল্পকলা জনগণবিমুখ এবং 'এর প্রেরণাপুঞ্জ সর্বজনীনভাবে মানবিক নয়।' (হুমায়ুন, ১৯৮৮ : ৪)। আধুনিক শিল্পকলার সঙ্গে তুলনা সাপেক্ষে রোমান্টিক ও ন্যাচারালিস্টিক শিল্পকলা মানবিক উপাদানের প্রাবল্যে পূর্ণ। জীবন ও শিল্পকলার ভিন্নতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আধুনিক কবি গড়ে তুলতে চান কবিতা বা শিল্পের স্বায়ত্তশাসন। হুমায়ুন আজাদ প্রসঙ্গত মালার্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা তিনি রোমান্টিক মানবিকতার স্তব না-করে মেনে নিয়েছেন মানবিকতা থেকে পলায়ন।

হুমায়ুন আজাদের এ-ধরনের চিন্তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় *আধুনিক বাংলা কবিতা* গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে। তাঁর ভাষায়, 'আধুনিকতাবাদের চারিত্র হচ্ছে সাহিত্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রথাগত রাষ্ট্রসীমা ভেঙে ফেলা, এর স্বভাব আন্তর্জাতিকতা।' (হুমায়ুন, ১১৯৯৪ : ৭)। রোমান্টিক আন্দোলনের পর আধুনিকতাবাদকেই তিনি মনে করেন সফল ও ব্যাপক শিল্পান্দোলন। আর আধুনিকতা বা আধুনিকতাবাদ একক কোনো আন্দোলন নয়, বরং আন্দোলনের সমষ্টি; বহুমাত্রিক শিল্পমতবাদ আধুনিকতাবাদের অংশী। আধুনিকতার স্বভাব সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'অন্যান্য কালের স্বভাব রীতির এককতা, আর আধুনিকতার স্বভাব রীতির বৈচিত্র্য'। (হুমায়ুন, ১৯৯৪ : ৮)। তাঁর আধুনিকতাবাদী ভাবনা সূত্রবদ্ধ করলে পাওয়া যায় :

> শিল্পকলার ইতিহাসে আধুনিকতাবাদই আয়ত্ত করতে চেয়েছে সবচেয়ে উন্নত নান্দনিক আত্মচেতনা... (১৯৯৪ : ৮)
>
> আধুনিকতাবাদী শিল্পকলা জীবনের গভীরে প্রবেশ করার জন্যেই দূরে স'রে যায় বাস্তবতা ও মানবিক উপস্থাপনা থেকে, এগিয়ে যায় রীতি, কৌশল, ও স্থানিক রূপের দিকে। এতে ঘটে নান্দনিক পরিশীলন, ঘটে শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ; শিল্পকলা থেকে ক্রমিকভাবে বাদ দেয়া হয় মানবিক উপাদান। (১৯৯৪ : ৯)
>
> আধুনিকতাবাদ চেয়েছে মানবিক উপাদানের বদলে শিল্পকলা উপভোগ করতে। (১৯৯৪ : ৯)
>
> আধুনিকতা আঙ্গিকের চরম বদল ঘটিয়ে তাকে কোলাহলের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে কখনো কখনো; অর্থাৎ আধুনিকতাবাদ শিল্পকলার নতুন রীতিই নয়, রীতির মহৎ বিপর্যয়ও। এর পরীক্ষানিরীক্ষা শুধু পরিশীলন, দুরূহতা, অভিনবত্ব সৃষ্টি করে নি, সৃষ্টি করেছে অন্ধকার, বিচ্ছিন্নতা, বিনষ্টি। (১৯৯৪ : ৯)

হুমায়ুন আজাদের আধুনিকতাবাদী চিন্তা সন্দেহাতীতভাবে প্রতীচ্যকেন্দ্রিক, বিমানবিক এবং শিল্পসর্বস্বতাবাদী। এ-আধুনিকতা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করে না। তবে কি মার্কসবাদী দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী কবিরা আধুনিক নন? তাহলে কী কারণে তাঁর গ্রন্থে সংকলিত হয়েছেন সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০০), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)? সংকলনে গ্রহণ করলেও এই সব প্রশ্নের উত্তর দানে অপারগ হুমায়ুন আজাদের আধুনিকতাবাদ। ফ্লবেয়ার, বোদলেয়ার, মালার্মে, ভলতেয়ার, ডারউইন, ফ্রয়েড প্রমুখ লেখক-তাত্ত্বিক ইউরোপের

প্রচলিত শিল্পকলা-ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-বিশ্বাস-মূল্যবোধ সম্পর্কে যে-ধরনের প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং প্রথাগত চিন্তাস্রোতে অভিনবত্বের যোগান দিয়েছিলেন সে-ধরনের প্রশ্ন ও উত্তরের সমবায় তাঁর আধুনিকতাবাদ। এ-আধুনিকতার সঙ্গে দেশীয় চিন্তা, মননের সংযোগ নেই। এ-কারণে তাঁর ঔপনিবেশিক আধুনিকতা অস্বীকার করেছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জসীম উদ্‌দীনের উপস্থিতি। এ-ধরনের আধুনিকতা দেশজ ধারার সঙ্গে যুক্ত নয় বলে মেনে নিতে পারে নি তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের সৃষ্টিশীলতা। এমনকি মৌলবাদ ও একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ততার অভিযোগে তিনি গ্রহণ করেন নি সৈয়দ আলী আহসান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬) ও আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতা। অথচ আধুনিক কবিতাবিশ্বের অন্যতম প্রধান রূপকার এজরা পাউন্ড ছিলেন নাৎসী বাহিনীর বান্ধব, অন্যদিকে এলিয়ট নিয়েছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক খ্রিষ্টবাদের আশ্রয়। কিন্তু তাঁরা সাম্প্রতিক বিশ্বেও আধুনিক হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক অনেক লেখকই মানুষ, মানবিকতা ও প্রগতিশীলতার বিপক্ষে চলে গেছেন; তাই বলে তাঁদের একদা-প্রগতিশীল আধুনিকতা বর্জিত হতে পারে না। হুমায়ুন আজাদ মূলত ইউরোপীয় অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের পরম্পরা ধরে বাংলা কবিতার আধুনিকায়ন বিবেচনা করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় আধুনিকতার অর্থেও তা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে।

আধুনিকতার চেতনা ও রূপকল্প নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আবিদ আনোয়ারের (১৯৫০) *বাঙলা কবিতার আধুনিকায়ন* (১৯৯৭)। আবিদ আনোয়ার বাংলা কবিতার যুগ-বিভাজনে আধুনিকায়নের দুই আরম্ভবিন্দু চিহ্নিত করেছেন : 'মধ্যযুগের শেষ প্রধান কবি ভারতচন্দ্রের কাল পেরিয়ে বাঙলা কবিতা প্রথমবার 'আধুনিক' যুগে প্রবেশ করলো মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে; এই স্রোতধারা পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম নামের দুই বৃহৎ বাঁক পেরিয়ে আরও একবার 'আধুনিক' হয়ে উঠলো এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে আবির্ভূত একদল কবির হাতে এসে।' (আবিদ, ১৯৯৭ : ১১)। কিন্তু আধুনিকতার দ্বিতীয় রূপটি প্রথমটির ঐতিহাসিক সম্প্রসারণ নয়। বরং ইউরোপীয় শিল্পসূত্র পরিগ্রহণের ফল। আবিদ আনোয়ারের মতে, বাংলা কবিতায় নৈঃসঙ্গ্যভাবনা, অবক্ষয়ী মনোভঙ্গি, এবং বিনষ্টিচেতনার সমাবেশ ঘটেছে মূলত বোদলেয়ার-এলিয়ট এবং ফরাসি প্রতীকবাদী, পরাবাস্তবতাবাদী কবিতার প্রভাবসূত্রে। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত ছন্দ-অন্ত্যমিল-অনুপ্রাস-উপমা-উৎপ্রেক্ষা-ব্যবহৃত যে-কলাপ্রকৌশলগত ধারা তৈরি হয়েছিল 'কল্লোল'-'কবিতা' যুগের আধুনিক কবিরা সে-সবের অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন ঠিকই; কিন্তু প্রাক্তন প্রয়োগের সঙ্গে আধুনিক প্রয়োগের বেশ কিছু পার্থক্যও আছে।

লেখক উনিশ শতকের ফ্রান্সের প্রসঙ্গ ধরে দেখিয়েছেন কবি ও চিত্রশিল্পীর যুগ্ম অংশগ্রহণে কবিতা ও চিত্রশিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে; আর 'আধুনিকতার আদি ফরাসি প্রবর্তকেরা--যাঁদের অনেকেই ছিলেন একাধারে কবি ও চিত্রকর — চেয়েছিলেন কবিতা ও চিত্রকর্মের আত্মিক পার্থক্য বিলুপ্ত করতে; "শব্দ-দিয়ে-চিত্রনির্মাণ" হয়ে উঠলো কবিতা রচনার মূল প্রকৌশল। আধুনিক বাঙালি কবিরা এই প্রকৌশলকে ব্যবহার করেই বিশ-শতকীয় বৈশ্বিক আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করেন তিরিশের দশকে।' (আবিদ, ১৯৯৭ :

৪১)। আবিদ আনোয়ারের আধুনিকতা বিষয়ক পর্যালোচনা কবিতার আধার ও আধেয় নির্ভর বলে বাংলা কবিতার ভাষা, ছন্দ ও রূপকল্পের রবীন্দ্রোত্তর বৈচিত্র্য ও নবীনতার বিশ্লেষণ এতে পাওয়া গেলেও আধুনিকতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ চোখে পড়ে না।

সে দিক থেকে তত্ত্বসন্ধানী গুরুত্বপূর্ণ লেখার সংকলন সালাহউদ্দীন আইয়ুবের *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*। মূলত আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতার তত্ত্ব-পরিচিতি হলেও এ বই থেকে নব্বইয়ের দশকের বাংলাদেশে বিকশিত আধুনিকতার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তাত্ত্বিক সমালোচনার অবয়ব চেনা যায়। আইয়ুব প্রশ্ন রেখেছেন, 'কলোনির কর্তাদের রেনেসাঁস ছিলো, এনলাইটেনমেন্ট ছিলো, শিল্পবিপ্লব ছিলো, — আমাদের কেনোটাই কখনো ছিল না, তবু আমরা কি করে অবিরাম জপ করে চলেছি আধুনিকতার? যে আধুনিকতা পশ্চিম প্রডিউস করেছে, আমরা তা রিপ্রডিউস করেছি।' (সালাহউদ্দীন, ১৯৯৮ : ৩৭)। আইয়ুবের প্রশ্ন আধুনিকতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাষ্য দাবি করে।

ইউরোপে সাহিত্যের আধুনিকায়নের ইতিহাস খেয়াল করলে দেখব রেনেসাঁর পর নব্য ধ্রুপদীবাদ, রোমান্টিকতাবাদ, বাস্তবতাবাদ, প্রকৃতিবাদ, প্রতীকবাদ — এ-রকম অনেকগুলো পর্বের সৃষ্টি হয়েছে। অন্ততপক্ষে পাঁচশ বছরব্যাপী সংঘটিত হয়েছে আধুনিক যুগের চিন্তার বিকাশ; জেগে উঠেছে মানবতাবাদ, ধর্মের উদারীকরণ, নগর ও গণতন্ত্রের বোধ এবং বেড়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ। এগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকায়নের মূল মোটিফ। আধুনিক সাহিত্যে, কবিতায় এই প্রসঙ্গগুলোই আবর্তিত হয়েছে নানাভাবে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে সাহিত্য আন্দোলনগুলো হয়ে ওঠে অস্থির। নানামাত্রিক শিল্পতত্ত্ব এক ঘূর্ণাবর্ত তৈরি করে। সব মিলিয়ে এর নামকরণ হয়েছে আধুনিকতাবাদ। অর্থাৎ রেনেসাঁসৃজিত আধুনিক যুগের নন্দনতাত্ত্বিক ইতিহাসের পরিণতি হিসেবে পাওয়া গেল আধুনিকতাবাদ।

নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বাংলাদেশে চর্চিত আধুনিকতার বেশ খানিকটা জুড়ে রয়েছে পাশ্চাত্যের প্রতিধ্বনি। আমরা যেন দীর্ঘ কাল যাবৎ প্রতীক্ষমান, কবে আমরা আধুনিক হয়ে উঠবো, কবে আমাদের মনের জড়তা ভাঙবে। এ-লেখায় বাংলাদেশে চর্চিত আধুনিকতা বিষয়ক ভাবনার একটি সমালোচনামূলক রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। এ-পরিচয় থেকে বুঝতে পারি, বাংলাদেশে আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদ কখনো কখনো সমার্থক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের আধুনিকতা কখনো মার্কসবাদী, কখনো জাতীয়তাবাদী, কখনোবা দেশজতার সঙ্গে প্রতীচ্যের সংকর। কবি ও তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা ও স্বীকৃতি নির্দেশ করে, বাংলাদেশের কবিতা প্রতীচ্যে উদ্ভূত শিল্পমতবাদগুলোর সঙ্গে সংহতি বজায় রেখেছে। তবু জাতীয়তাবাদ ও মার্কসবাদী চিন্তাস্রোতের সহগামী হয়ে বাংলাদেশের আধুনিকতা অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। উত্তর-আধুনিকতা, উত্তর-ঔপনিবেশিকতা, নারীবাদ, পরিবেশবাদ — এ-রকম আরও অনেক তত্ত্বের তরঙ্গে বদলে গেছে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের আধুনিকতা বিষয়ক ধারণা।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অনুপম হায়াৎ (২০০১)। *পুরনো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

অশ্রুকুমার সিকদার (১৯৯৪)। *কবির কথা কবিতার কথা*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

অসীম সাহা (১৯৭৬)। *প্রগতিশীল সাহিত্যের ধারা*, মুক্তধারা, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৯)। *চেতনায় জল পড়ে শিল্পের পাতা নড়ে*, শিল্পতরু, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (১৯৯২)। *উত্তরপ্রজন্ম*, শিল্পতরু, ঢাকা।

আবদুল হক (১৯৮৪)। *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০০২)। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

আবিদ আনোয়ার (১৯৯৭)। *বাঙলা কবিতার অধুনিকায়ন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯৯৯)। *আধুনিক বাংলা কবিতা* (সম্পা. : আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

আল মাহমুদ (২০০৩)। *সাক্ষাৎকার আল মাহমুদ* (সম্পা. সাজ্জাদ বিপ্লব), ঐতিহ্য, ঢাকা।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৮২)। *কবিকণ্ঠ* (সম্পা. ফজল শাহাবুদ্দীন), দ্বিতীয় সংখ্যা।

আহমদ রফিক (২০০৭)। *শিল্প সংস্কৃতি জীবন*, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা।

ইয়েনেকা আরেন্স ও ইওস ফান ব্যুরদেন (১৯৯৮)। *ঝগড়াপুর* (অনু. নিলুফার মতিন), গণপ্রকাশনী, ঢাকা

এ.জি. স্টক (২০০১)। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি' (অনু. : মোবাশ্বেরা খানম), *ঢাকার স্মৃতি-২* (সম্পা. মুনতাসীর মামুন), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৯৯০)। *উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯৯৪)। 'কবিতায় আধুনিকতার অভিঘাত', *চল্লিশের দশকের ঢাকা* (সম্পা. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (১৯৯০)। *একবিংশ* (সম্পা. খোন্দকার আশরাফ হোসেন), ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা (১৯৬৮)। *আমার চিন্তাধারা*, আহমদ পাবলিশিং, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ (২০০০), *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র*, গতিধারা, ঢাকা।

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৯২)। *একবিংশ* (সম্পা. খোন্দকার আশরাফ হোসেন), সেপ্টেম্বর, ঢাকা।

দেবেশ রায় (২০০৩)। *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা।

নাসির আহমেদ (১৯৮৪)। *এক দশকের কবিতা*, পারিজাত, ঢাকা।

নির্মলেন্দু গুণ (২০০১)। 'দুই কবির মেলামেশা', *শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ*, শামসুর রাহমান, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (২০০০)। *আজি হতে শতবর্ষ আগে*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০০৮)। *প্রজা ও তন্ত্র*, অনুষ্টুপ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা।

(২০০০), *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু (১৯৮৩)। *আধুনিক বাংলা কবিতা*, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল (২০০৩)। 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের কবিতা : পরিপ্রেক্ষিত', *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* (১৯৭২-৯৭)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মহাদেব সাহা (১৯৮৪)। *আনন্দের মৃত্যু নেই*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৯৮১)। *শর্তহীন শর্তে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (১৯৯০)। *উনিশ শতকে ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা।

(১৯৯০ ক)। *চকবাজারের কেতাবপট্টি*, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা।

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ (১৯৬১)। 'সাম্প্রতিক সাহিত্যের ভাবধারা', *মাহে-নও* (সম্পা. আবদুল কাদির), ১৩ বর্ষ, সংখ্যা ৮। নভেম্বর, ঢাকা।

মোহাম্মদ রফিক (১৯৭২)। "আমরা ও আমাদের ক্লাসিকস চর্চা", *কণ্ঠস্বর*, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, সম্পাদক : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১৭)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতা : সমবায়ী স্বতন্ত্র স্বর*, একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (১৯৯২)। *কিছুধ্বনি* (আনওয়ার আহমদ), নভেম্বর, ঢাকা।

(২০০১)। *শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা।

সিকদার আমিনুল হক (১৯৯৫)। *মৃত্যুচিন্তা : এবার হলো না গান*, শিল্পতরু, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০২)। *প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (১৯৯০)। *হরিশচন্দ্র মিত্র*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (১৩৭৫)। *কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা*, বইঘর, চট্টগ্রাম।

হবীবুল্লাহ বাহার (১৯৭১)। *হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (১৯৮৯)। 'বাংলা সাহিত্য ও অন্য দিগন্ত', *সমকালীন বাংলা সাহিত্য* (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

হায়াৎ সাইফ (১৯৯২)। *উক্তি ও উপলব্ধি*, শিল্পতরু, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৯৪)। *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৮)। *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ইউপিএল, ঢাকা।

(১৯৯৪)। *আধুনিক বাংলা কবিতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Bil Readings (1992). *Introducing Lyotard*, Routledge, London.

Gerard Delanty (2000). *Modernity and Postmodernity*, Sage Publications, London.

Jurgen Habermas (2001). 'Modernity – An Incomplete Project', *The Norton Anthology of Theory and Criticism* (Editor : Vincent B. Leitch), W.W. Norton and Company.

Malcom Bradbury and McFarlane (1991). *Modernism (1890-1930)*, Penguin Books, London.

Peter Hamilton (1995). 'The Enlightenment and the Birth of Social Science', *Formation of Modernity*, (Edited by Sturat Hall and Bram Gieben), The Open University, Cambridge.

Stephen Spender (1965). *The Struggle of the Modern*, London

Thomas Docherty (1990). *After Theory : Postmodernism/Postmarxism*, Routledge, London.